দাম : যোলো টাকা

স্বস্তিকা

সিএএ এবং এন আর সি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের ভ্রান্তিবিলাস — পৃঃ ২৩

সংশোধিত নাগরিক আইনের প্রয়োগে ভারতীয় মুসলমানদের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ১ এপ্রিল, ২০২৪।। ১৮ চৈত্র, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CITIZENSHIP AMENDMENT ACT -2019

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন - ২০১৯

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ১৮ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১ এপ্রিল - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,
Website : www.eswastika.com

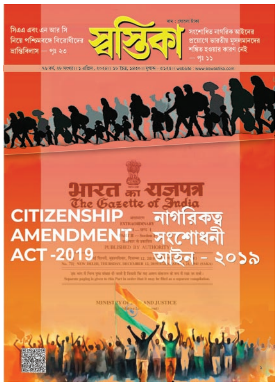

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

প্রশ্ন উঠছে, ‘কবিতা-কেজরিওয়াল’ আটক হলে ‘অভিষেক-মমতা’ নয় কেন? শীত কাটছে তাই বসন্ত
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির রচনা বনাম মোদীর ‘সরল’ রেখা
◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতের মুসলমানদের দেওবন্দের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে
◻ সুবুহী খান ◻ ৮

কেজরির বিরুদ্ধে খালিস্তানি জঙ্গিদের থেকে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রয়োগে ভারতীয় মুসলমানদের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই ◻ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ◻ ১১

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯ (সিএএ) উদ্বাস্তুদের মাথা উঁচু করে বাঁচার আইন ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

অনলাইনে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া
◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১৫

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের লোগো নিয়ে বিতর্ক অহেতুক ও অন্যায্য ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৭

সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের ভ্রান্তিবিলাস
◻ সঞ্জীব রায় ◻ ২৩

হিন্দুধর্মের অনন্য প্রকাশ অবতার ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

হরে কৃষ্ণ ◻ সন্দীপ ঘোষাল ◻ ৩৪

সামাজিক সমরসতা সঙ্ঘের রণনীতি নয়, নিষ্ঠার বিষয় : দত্তাত্রেয় হোসবালে ◻ ৩৫

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে বিরোধিতা আদতে মানবাধিকারের অসম্মান
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্র পরিচিতি ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৮ এপ্রিল, ২০২৪

প্রকাশিত হবে ৮ এপ্রিল, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গ্রীষ্মের প্রখরতা— কীভাবে সুস্থ থাকবেন

শীত অতিক্রান্ত। গ্রীষ্মের প্রখরতা চোখ রাঙাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও তীব্র হচ্ছে জলসংকট। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও এই সংকটের মুখোমুখি হতে হয় প্রতিবছর। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে জলসংকট ছাড়াও গ্রীষ্মকালীন নানান রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক ও চিকিৎসক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজনীতি নহে, রাষ্ট্রনীতি

দেশবিভাগ ভারতবাসীর জীবনে এক অভিশাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখকে উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে, হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে, হাজার হাজার হিন্দু ও শিখকে জীবন হারাইতে হইয়াছে। জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে তাহারা ভারতে আশ্রয় লইয়াছেন। সমস্যার নিরসন কল্পে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু কাজের কাজ তাহাতে কিছুই হয় নাই। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। চুক্তির প্রতিবাদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ পর্যন্ত করিয়াছেন। তাঁহারা পাকিস্তানের মনোভাব ভালোভাবেই জানিতেন। বাস্তবে তাহাই হইয়াছে। পাকিস্তান তাহার দেশের সংখ্যালঘুদিগের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান বাঁচাইতে কোনোরূপ পদক্ষেপ করে নাই। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারও শরণার্থীদিগের জন্য কোনোরূপ জাতীয় নীতি প্রণয়ন করে নাই। দশকের পর দশক ধরিয়া শরণার্থীরা উদ্বাস্তু চিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্বতন ভারতীয় জনসঙ্ঘ অধুনা ভারতীয় জনতা পার্টি বারবার দাবি জানাইয়াছে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান হইতে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত সংখ্যালঘুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার তাহাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে নাই। ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসিয়া পুরাতন নাগরিকত্ব আইনে পুনরায় কিছু সংশোধন করিয়া, ২০১৯ সালে সংসদে বিল পাশ করাইয়া আইনে পরিণত করিয়া শরণার্থীদিগকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ হইতে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান শরণার্থীদিগকে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হইবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় দীর্ঘ আলোচনা হইয়া সংসদে পাশ হইবার পরও ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি এই আইনের বিরোধিতা করিয়া, অপপ্রচার করিয়া বাজার গরম করিয়াছে। তাহাদেরই মদতে জেহাদি মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা সমগ্র দেশে দেশবিরোধী কার্যকলাপে মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাহারা দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মূলত শাসকদলের মদতে জেহাদিরা রাজ্যের জনজীবন স্তব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। দুঃখের বিষয় হইল, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসকারীদের একজনের বিরুদ্ধেও রাজ্য সরকার কোনোরূপ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই আইনের বিরুদ্ধে সভাসমিতি করিয়া মানুষকে উত্তেজিত করিয়াছেন। কংগ্রেস-সহ যাহারা একসময় শরণার্থীদিগের নাগরিকত্ব প্রদানের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিল, তাহারাও তাহা ভুলিয়া তোষণনীতি ও ভোটব্যাংকের লোভে এই আইনের বিরোধিতা করিতেছে। করোনা মহামারির কারণে আইনটি বলবৎ করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্ব হইয়াছে, তাহার জন্য তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা পর্যন্ত করিয়াছে।

অবশেষে বিভিন্ন কারণে চার বৎসর অতিবাহিত হইবার পর গত ১১ মার্চ ২০২৪, আইনটি বলবৎ করিবার নির্দেশিকা জারি করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, এই আইনটি শুধুমাত্র শরণার্থীদিগকে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য; কাহারও নাগরিকত্ব খর্ব করিবার জন্য নহে। যাহাদের নথিপত্র রহিয়াছে তাহার যেইরূপ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, যাহাদের কোনোপ্রকার নথিপত্র নাই তাহারাও সেইরূপ আবেদন করিতে পারিবেন– ইহাতে শঙ্কার কোনো অবকাশ নাই। কিন্তু অবাক করিবার কথা হইল, আইনটি বলবৎ করিবার নোটিফিকেশন জারি হইতেই বিরোধীরা পুনরায় বিরোধিতায় সরব হইয়াছেন। তাহাদের দাবি– পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ হইতে আগত কেবলমাত্র ছয়টি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাই কেন নাগরিকত্ব লাভের উপযুক্ত, মুসলমানরা কেন নহে? তাহাদের দাবি শুনিয়া মনে হইতেছে, তাহারা শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য করিতে পারিতেছেন না। কিংবা পারিলেও তোষণ ও ভোটব্যাংকের লোভে এইরূপ আচরণ করিতেছেন। রাজনৈতিক বিরোধীরা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রনীতি ভুলিয়াছেন, ইহা খুবই দুঃখের।

সুভাষিতম্

মূলং ভুজঙ্গৈঃ শিখরং বিহঙ্গৈঃ শাখাঃ প্লবঙ্গৈঃ কুসুমানি ভৃঙ্গৈঃ।
আশ্চর্যমেতৎ খলু চন্দনস্য পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ।।

চন্দনবৃক্ষ তার মূলে সাপকে, শিখরে পক্ষীকুলকে, শাখায় বাঁদরদের এবং নিজের ফুলে ভ্রমরদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। সেইরূপ, সজ্জন ব্যক্তিরাও সর্বদা পরোপকারের জন্যই সবকিছু করে থাকেন।

প্রশ্ন উঠছে, ‘কবিতা-কেজরিওয়াল’ আটক হলে ‘অভিষেক-মমতা’ নয় কেন?

শীত কাটছে তাই বসন্ত

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের লাইনে তিনি অষ্টম। এর আগে ঝাড়খণ্ডের শিবু সোরেন, মধু কোড়া, হেমন্ত সোরেন, লালুপ্রসাদ যাদব, জয়ললিতা, বিএস ইয়েদুরপ্পা ও চন্দ্রবাবু নাইডু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকা মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে জয়ললিতার পর কেজরিওয়াল দ্বিতীয় যিনি গ্রেপ্তার হলেন। বাকিরা পদ ছেড়ে দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হন। শিবু কয়লা মন্ত্রী থাকার সময় আটক হন। তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যা কবিতাও গ্রেপ্তার হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে কেজরিওয়ালের আবগারি মামলায় তিনি রাজসাক্ষী হবেন। রাজনীতি পিছন থেকে ছুরি মারার খেলা। যে দক্ষ তৎপর তার সাময়িক বাড়বাড়ন্ত।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা’। অর্থাৎ তিনি দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়বেন। তাই পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কীভাবে এই রাজ্য মোদীর লক্ষ্যের বাইরে রয়েছে? সতেরোটি রাজ্যে বিজেপি এককভাবে এবং জোট করে ক্ষমতায় রয়েছে। সেখানে ছোটো-খাটো দুর্নীতি হলেও ধরা পড়ছে। সাজা হচ্ছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম কেন? এ ভাবনা একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। আশু সমাধান প্রয়োজন। ২০১৩ থেকেই পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য। দুর্নীতি করে মোট ২৫ জন নেতা মন্ত্রী জেলে রয়েছেন। অথচ রাজ্যের দুই মাথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খোলা মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। যদিও রাজ্যের যাবতীয় দুর্নীতি সব তদন্তই বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আওতায়। বিচারাধীন বিষয়ের শম্বুকগতির জন্য হয়তো কেন্দ্রীয় এজেন্সিসমূহ দায়ী নয়। মমতার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো অভিযোগ নেই। অভিষেকের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকেই ইডি-র ফৌজদারি অভিযোগ (ইসিআইআর) রয়েছে। মোট সাতটি বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আঙুল উঠেছে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই। মানুষ প্রশ্ন করছেন, কেন ও কী করে তা সম্ভব হচ্ছে? বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র বাঁচে না। এখানকার প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সোচ্চার আন্দোলনে রয়েছে। তবুও কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। তারা নিশ্চিত মমতা ও তার দল আর তার পরিবারের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যের মানুষ ক্রুদ্ধ। সেই ক্রোধকে ২০২৪-এর ভোট বাক্সে তারা নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু মানুষের সেই ক্ষোভ কেন মান্যতা পাচ্ছে না। প্রমাণ থেকেও ‘মাথাদের’ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হচ্ছে না। এটা কি তদন্তের ব্যর্থতা নাকি ঢিলেমি। আজগুবি কোনো তত্ত্ব দিয়ে তা প্রমাণ হয় না।

বিরোধীহীন গণতন্ত্র স্বাস্থ্যকর নয়। তাই বিরোধীদের দায়িত্বশীল হতে হয়। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে অবগত করাতে হয়। প্রশাসনকে রাজনীতির আঁশ ছাড়িয়ে ময়দানে নামাতে হয়। তাতে বিরোধী দলের সম্মান রক্ষা হয়। দলহীন গণতন্ত্র বায়বীয় ধারণা। তাই চূড়ান্ত ক্ষমতার লোভে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। সে একক রাজত্ব কায়েম করতে চায়। দুর্নীতির তদন্তে আনুমানিক ৩২ মাস কেটে গেলেও রাঘববোয়ালরা খেলে বেড়াচ্ছে। আন্দাজ হয় আসন্ন লোকসভা ভোটে বিজেপি অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তবু একটু ইতস্তত ভাব রয়েছে। মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে মানুষের দরবারে এখনো কোনো সদুত্তর নেই।

কেজরিওয়াল, হেমন্ত ও কবিতার গ্রেপ্তারি মমতার অস্বস্তি বাড়িয়েছে। তদন্তের অনুভূতিহীন অযোগ্যতার ফাঁকে প্রধান অপরাধীরা গলে যাচ্ছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে দু’ধরনের দুর্নীতিপরায়ণ শাসক নেতৃত্ব— মমতা আর অভিষেকপন্থী। প্রথম দলের অনেকে ধরা পড়েছে। দ্বিতীয়র লোকেরা প্রথমকে ফাঁসিয়ে পিঠ বাঁচতে চাইছে। দুর্নীতিবাজদের জাঁতাকলের জটে মানুষ হয়তো সাময়িকভাবে আটকে পড়েছেন। আমি আশাবাদী জট শীঘ্র খুলবে। রাজনৈতিক সামঞ্জস্যের উদ্ভট তত্ত্ব উবে যাবে। বিদেশি বামপন্থী আর জাতীয় কংগ্রেস ‘সোনার পাথর বাটি’ আর ‘আকাশ কুসুম’ ন্যারেটিভ বানাতে সচেষ্ট যা কিনা বিজেপি আর তৃণমূলের সামঞ্জস্যের রাজনীতি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া একটি রায় অনুযায়ী লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন কোনো তদন্তকারী সংস্থার তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাবা চলবে না। হারাধনের সন্তানেরা বোঝেন না সিংহ আর শৃগালের বন্ধুত্ব হয় না। সেটাই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের তফাত। মমতা আর অভিষেককে ঘিরে রাজ্যে যে শীতঘুমের ভাবনা ছিল তা ধীরে ধীরে কাটছে। শীত কেটে গিয়েছে। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। মানুষ আর একটু অপেক্ষা করুন। □

দিদির রচনা বনাম মোদীর 'সরল' রেখা

সেলেবপ্রিয়াষু দিদি,

আপনার সেলেবদের প্রতি আকর্ষণ দিদি সত্যিই দেখার মতো। বিশেষ করে টিভির জগতের লোকেদের সঙ্গে আপনার ওঠাপড়া, এর সংসার ভাঙা ওর সংসার গড়া এসবও আপনাকে সামলাতে হয় শুনেছি। আপনার দলের সাংসদ নুসরত জাহান, বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকদের বিয়ে ভাঙা আর গড়া নিয়ে যখন কেচ্ছার ছড়াছড়ি তখনই শুনেছি আপনার দলের একেবারে রাজনৈতিক নেতাদের কেচ্ছাও আপনাকে অনেক সময়ে চাপা দিতে হয়েছে।

সেসব কথা বলতে অবশ্য আজকের চিঠি নয়। এবার আপনি নুসরত, মিমি দিদিদের টিকিট না দিয়ে নতুন রচনা লিখলেন লোকসভা নির্বাচনে। টিভির অনুষ্ঠান, 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এ এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি রুটি বেলেছেন, নেচেছেন। বেশ করেছেন। কিন্তু তাই বলে ঐতিহ্যের লোকসভা কেন্দ্রে ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে দিলেন! যিনি স্ক্রিপ্ট ছাড়া একটা লাইনও নিজের থেকে বলতে পারেন না। তিনি তো হুগলিতে গিয়েই বলে দিয়েছেন, ওঁর আগমন এই এলাকার জন্য ভাগ্যের। হুগলির গর্ব করার, অহংকার করার অনেক কিছুই রয়েছে। রাজনীতির জগতেও তার অভাব নেই।

হুগলির অভাব একটা সময়ে শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত জেলায় আপনার আমলে কোনও শিল্পই নেই। বাম আমলের ধারা বজায় রেখেছেন আপনি। প্রথমে বলেছিলেন, 'হুগলির মানুষ খুব লাকি যে আমাকে দেখতে পাবে'। আর রচনা শিল্প নিয়ে বলেছেন, 'আমি যখন এলাম দেখলাম অনেক কারখানা হয়েছে। চিমনি থেকে শুধু ধোঁয়াই ধোঁয়া, রাস্তাঘাট অন্ধকার। শুধু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এত কারখানা হয়েছে, তাহলে কী করে বলছেন কারখানা হয়নি, হয়েছে আরও হবে।'

আহা রে! আপনার স্তুতি করতে গিয়ে নির্মল আকাশেও তিনি শিল্পের ধোঁয়া দেখে ফেলেছেন। আবার সিঙ্গুরে গিয়ে অন্য কেলেঙ্কারি। সেখানে টাটার কারখানার জমিতে কিছুই হলো না আজও। কর্মসংস্থানের স্বপ্ন নিভে গিয়েছে। জমিতে শুধুই বড়ো বড়ো ঘাস। আপনি সর্ষে বীজ ছড়িয়েছিলেন কিন্তু কেউ সর্ষে দেখতে পায়নি। চোখে সর্ষেফুল দেখালেন রচনা। এক বাড়িতে খেতে বসেছিলেন। টক দই খেয়ে ঠিক যেমন টিভিতে সবেরই প্রশংসা করতে যা খুশি বলতে হয় তেমন ঢঙে বলেছেন, 'আমাদের ওখানে তো এমন টক দই হয়ই না, কলকাতাতে ওটা কী হয় কে জানে! আমি তো ভাবছি এবার এলেই ব্যাগে করে দই নিয়ে যাব। দারুণ দারুণ।' তারপরে আরও এক কদম কেলেঙ্কারি। বলেছেন, 'সিঙ্গুরের সবুজ ঘাস, গাছ-পালা খেয়ে গোরু হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। তারপর তার যে দুধটা বেরোচ্ছে যে দইটা এত ভালো। চারিদিকের পরিবেশটাই বাঙ্গারামদা (স্থানীয় তৃণমূল নেতা) ভালো করে রেখেছে যে ঘাসপাতা খেয়ে গোরু হৃষ্টপুষ্ট।'

> এলাকায় এলাকায় 'ক্ষমা প্রার্থনা' করে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর আর্জি জানাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। শেখ শাজাহান, শিবু-উত্তমের 'কৃতকর্মের' কথা মাথায় রেখে আপাতত এই কৌশলই নিয়েছে দল। কিন্তু সত্যই বলুন তো দিদি, আপনার দল কি আদৌ ক্ষমার যোগ্য কোনও কাজ সেখানে করেছে?

ভোটে জিতে ওই টিভি অ্যাংকার কী করবেন, তাও বলেছেন। রচনার কথায়, 'যদি বিজয়ী হই, তবে সবথেকে বড়ো কাজ যেটা করব সেটা হলো চ্যানেলের সঙ্গে আগে বসব। চ্যানেলকে বলব, হুগলির দিদিদের আগে ডাকো। সবাইকে বলব, আমাকে যদি দিদি নম্বর ওয়ান করতে চাও, হুগলি জেলার মানুষ যাঁরা আমাকে জিতিয়ে নিয়ে এসেছে, হুগলি জেলার দিদিদের আগে 'দিদি নম্বার ওয়ান'-এ ডাকো। তার পরে অন্য সব দিদিরা আসবে।' আহা! এই না হলে প্রতিশ্রুতি। টিভির অনুষ্ঠানে গিয়েই কর্মসংস্থান হয়ে যাবে! এঁকে দিদি আপনি লোকসভায় পাঠাতে চান?

অন্যদিকে দিদি, বসিরহাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূত এক 'সরল' রেখা। তিনি নির্যাতিতাদের মুখ। তিনি নিজেও সেই দলেই পড়েন। আপনার ভাইয়েরা যে কুকাণ্ড করেছেন তা সামনে নিয়ে আসার আর দরকার নেই। কিন্তু সেই মানুষদের একজন প্রতিনিধি যদি লোকসভায় যায় তবে গোটা দেশ বুঝবে মোদী ঠিক কী চান? সমাজের কোন শ্রেণীকে তিনি আলোর দিশারি বানাতে চান। যে সমাজকে এতদিন নির্যাতনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখের মাধ্যম হিসেবেই শুধু ব্যবহার করা হয়েছে।

আর বসিরহাটে আপনার দল কী করছে? এলাকায় এলাকায় 'ক্ষমা প্রার্থনা' করে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর আর্জি জানাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। শেখ শাজাহান, শিবু-উত্তমের 'কৃতকর্মের' কথা মাথায় রেখে আপাতত এই কৌশলই নিয়েছে দল। কিন্তু সত্যই বলুন তো দিদি, আপনার দল কি আদৌ ক্ষমার যোগ্য কোনও কাজ সেখানে করেছে? □

অতিথি কলম

সুবুহী খান

ভারতের মুসলমানদের দেওবন্দের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে

গজবা-এ-হিন্দ নিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় এবং যে সব বিদ্বান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, তাদের উচিত কোনো ধারণাকে সমাজের সামনে আনার আগে তার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও যাচাই করা।

এই সময় দারুল উলুম, দেওবন্দের এক ফতোয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে। এই ফতোয়াতে দারুল উলুম, দেওবন্দ গজবা-এ-হিন্দকে সঠিক বলে দাবি করা হয়েছে। এর পরেই দেশ-বিদেশে পুনরায় একে জানার চেষ্টা চলছে যে এই গজবা-এ-হিন্দ আসলে কী? আমরা যদি তার শব্দগত অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি তবে তা হলো হিন্দ অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। 'গজবা' অর্থাৎ 'যুদ্ধ' এবং 'গাজি' হলো 'আল্লার পথে যুদ্ধকারী।' কিন্তু ইসলামি বিদ্বানদের মতে গজবা-এ-হিন্দে হিন্দ বলতে হিন্দুস্থান বোঝানো হয়নি, কেননা আরবিতে হিন্দ্ মানে পরাক্রমী। তাদের মতে গজবা-এ-হিন্দের অর্থ এমন একজন পরাক্রমী যে আল্লার পথে যুদ্ধ করে। এরা নিজেদের কথার প্রমাণ করতে উদাহরণ দেয় যে আবু সুপিয়নের স্ত্রীর নাম ছিল বিবি হিন্দ, আর এই হিন্দ শব্দটিও একটি আরবি শব্দ। তর্কের খাতিরে তা মেনে নিলেও আল্লার জন্য যুদ্ধ করা কতটা যুক্তিযুক্ত?

গজবা তা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে হোক বা যে কোনো দেশ, সমাজ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধেই হোক, কিন্তু একজন লোককে আল্লার হয়ে লড়াই করার অনুমতি কে দিয়েছে? কোরানে গজবা-এ-হিন্দের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। যারা গজবা-এ-হিন্দকে আল্লা বা পয়গম্বরের নির্দেশ বলে মনে করে, তাদের বক্তব্য হলো যে এর উল্লেখ কিছু হাদিসে রয়েছে। আর যখন আমরা হাদিসের সম্বন্ধে খোঁজ করি তখন জানা যায়, পয়গম্বর মুহাম্মদের মৃত্যুর পর হাজার হাজার জাল হাদিস লেখা হয় আর মুসলমান সমাজ আজও সেই হাদিসগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এগুলির মধ্যে কিছু হাদিসে পয়গম্বরের সম্বন্ধেই মিথ্যা, জাল আর অশ্লীল কথা রয়েছে। এছাড়াও মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ এই হাদিসগুলিকে সত্য বলে মনে করে। এই কারণেই বর্তমানে মানুষজন ইসলামের উপর প্রশ্নচিহ্ন তোলে। আমাদের সম্প্রদায় কখনোই নিজস্ব মজহবি গ্রন্থ বুঝতে বা তাতে সংশোধন করার কোনো চেষ্টাই করেনি।

এই সমস্যার মূলে যেতে হলে বুঝতে হবে এই মিথ্যা হাদিসগুলোকে কে এবং কেন লিখেছে? মুহাম্মদের মৃত্যুর পর, তার উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। কারণ তার কোনো পুত্রই জীবিত ছিল না, শুধুমাত্র একটি কন্যা ছিল। উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ জনদের মধ্যে তারাই ছিল যারা নবির মৃতদেহকে ১৮ ঘণ্টা রোদের মধ্যে ফেলে রেখেছিল। কারণ এই তারা চাইছিল যে কে খলিফা হবে তা আগে নির্ধারণ করা হোক। এরাই নবির কন্যা, বিবি ফাতিমা, তার স্বামী মওলা আলি এবং তাদের সন্তান ইমাম হাসান ও হোসাইনকে তাদের অধিকার দেয়নি। নবি সাহেব জীবদ্দশায় কোনো গ্রন্থ বা হাদিস রেখে যাননি।

এই সমস্ত সম্প্রদায়গত গ্রন্থ ও হাদিস তাঁর মৃত্যুর পর লেখা হয়েছিল। খলিফারা মওলা আলির লেখা কোরানের পুণ্ডুলিপি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং এটিকে কোরানের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়নি। তৃতীয় খলিফা কোরানের প্রায় ৫০০ প্রতিলিপি নষ্ট করে দেয় এই বলে যে আমরা যেগুলো সংগ্রহ করব সেগুলিকেই সঠিক বলে মানতে হবে। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর এইসব লোক ইসলামের নামে যুদ্ধ শুরু করে বিভিন্ন দেশ দখল করা শুরু করে। এরা যখন নতুন দেশ আক্রমণ করে জয় করত, তখন তারা সেখানকার সুন্দরী মেয়েদের নিকা করার জন্য নিজের স্ত্রীদের তিন তালাক বলে পরিত্যাগ করতে শুরু করে। আর সেখান থেকেই তালাক-ই- বিদ্দত-এর প্রচলন হয়। এইভাবে মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে সমস্ত বদভ্যাস প্রবেশ করতে থাকে।

এই লোকেরা নবির পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল যাতে কেউ আওয়াজ তুলতে না পারে। তাদের নিজেদের কামনা চরিতার্থ করতে নবি ও ইসলামের নাম নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে ও লিখতে থাকে। মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য যে তারা এই ইতিহাস জানে না এবং যারা জানতে প্রশ্ন করে তাদের কাফের, মুনাফিক ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ভয় দেখানো ও শাসানো হয়।

একটি মজহবকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার জন্য এরা 'ইসলামিক স্টেট' তত্ত্ব খাড়া করে। এই ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করতে তাদের দরকার এমন মুসলমান সন্তান যারা তাদের ইশারায় ইসলামের নামে যুদ্ধ করে গাজি হতে পারে। কোনো সুস্থ মনের কেউ কখনই তা করবে না। তাই মুসলমান সমাজের বাচ্চাদের মানসিকভাবে দাস বানানোর জন্য এরা ছোটোবেলা থেকেই ভয়ে ভীত করে রাখে। হারাম, হালাল ও ফতোয়া ব্রিগেডের দীর্ঘ তালিকা মুসলমান বাচ্চাদের মানসিকভাবে ক্রীতদাস করার আরম্ভ মাত্র। দীর্ঘ সময় ধরে যখন একটি শিশুকে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয় না এবং ফতোয়া ব্রিগেড তাকে বলে দেয় কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, তখন এমন একটা সময় আসে যখন শিশুটি তার চিন্তাভাবনা করার এবং বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

এই মানসিক দাসত্ব আমাদের সমাজের শিশুদের মধ্যে এখনও চলছে। একটি সুস্থ মনকে আতঙ্কবাদী বা গাজি তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রথমে মুসলমান শিশুদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বানানো হয়। তাদের বলা হয় তার খাদ্যাভ্যাস,

বস্ত্র পরিধান, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা, সবকিছুই আলাদা। মন্দিরে গিয়ে বা অন্য কোনো উপাসনা অবলম্বন করে আল্লার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করলে সে কুফ্র (অবিশ্বাসী) হবে।

যদি সে তিলক লাগায় তবে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে। এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বানানো হয়। এরপর তাকে কট্টরবাদী তৈরি করা হয়। তাকে বলা হয় তুমি যেটা ভাবছো সেটাই ঠিক, বাকি সব ভুল। শেষ পর্যন্ত তাকে আতঙ্কবাদী বা গাজি বানানো হয়। আমরা যদি শুধু ভারত থেকে নয়, বরং গোটা বিশ্ব থেকে আতঙ্কবাদ ও কট্টরবাদকে নির্মূল করতে চাই, তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদকে নির্মূল করতে হবে। আমরা যদি ভারতে জন্মগ্রহণ করি, ভারতীয় মুসলমান হই, তবে আমাদের ভাষা, পোশাক, খাদ্য, ভবন, ওষুধ, ভজন ইত্যাদি ভারতীয় হওয়া উচিত। 'ইসলামিক স্টেট'-এর ষড়যন্ত্র আমরা কেন বহন করতে যাব? আমরা কেন কারও মানসিক দাস হয়ে থাকব?

একটি জিনিস যা আমাদের বোঝা উচিত এবং সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ভারতের মুসলমানরা সর্বদা ভারতীয় সংস্কৃতিতে লালিত- পালিত হয়ে আসছে। রহিম, রাসখান, দারা শিকো, কবীর প্রভৃতি সনাতনী মুসলমানদের ইতিহাস আজও আমাদের দেশে প্রকৃতির সুগন্ধবাহী। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর মুখটি শুধুমাত্র ভারতেই হয়েছে, কারণ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সংস্কৃতির নামে নয়, আচার-আচরণের মধ্যে রয়েছে যা কিনা প্রকৃতি কেন্দ্রিক। এই আচরণ জীবন মূল্যবোধকে আত্মসাৎ করে, যা প্রতিটি মানুষ, প্রকৃতি, জড় ও জীব সকলকেই তার আপন বলে মনে করে। এই জীবন মূল্যবোধের কারণেই শত শত বছরের আক্রমণ ও প্রচেষ্টার পরেও আজও ভারতীয় সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে চলেছে। এই কারণেই যে ঔরঙ্গজেব ভারতে আগ্রাসী হয়ে উঠলে তার ভাই সনাতনী মুসলমান দারা শিকো তার হত্যার জন্য প্রথম তার সামনে এসে দাঁড়ায়। এ সবের জন্যই 'ইসলামিক স্টেট'-এর ষড়যন্ত্রকারীরা ভারতের মুসলমানদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি বড়ো পরিকল্পনা করে। এটা বোঝার জন্য আমাদের কিছু বিশেষ ঘটনার দিকে নজর দিতে হবে।

১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবে যখন প্রতিটি ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার লড়াই করেছিল, তখন ভারত বিরোধীরা ভারতের মুসলমানদের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে একটি বিমর্শ (ন্যারেটিভ) শুরু করে যে, মুসলমানদের সব কিছুই ভারত থেকে আলাদা। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে দারুল উলুম এবং ১৮৭৫ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভাগ করা হয়। ১৯০৬-১৯০৭ সাল নাগাদ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবি ওঠে। ১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলন চালানো হয়। ১৯২০ সালের পর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের দাবি উঠতে শুরু করে।

১৯২৫ সালে তবলিগি জামাত প্রতিষ্ঠা হয়। 'শরিয়া অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট' ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। ১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এবং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজন হয়। আমাদের সর্বদা এই তারিখগুলি মনে রাখা উচিত। কারণ এসবই দ্বিজাতিতত্ত্বের মানসিকতার প্রতিফলন। ১৯৩৭ সালে 'শরিয়া অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট' প্রবর্তনের আগে, ভারতের মুসলমানরা ভারতের আইনে মেনে চলত। মুসলমানদের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং তার সঙ্গে পাকিস্তান গড়ার জন্য প্রস্তুত করতে ব্রিটিশ ও মুসলিম লিগ এই আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের সঙ্গে ইসলাম বা নবির কোনো সম্পর্ক নেই।

আজও ভারতে এমন অনেক সংগঠন কাজ করছে, যারা মুসলমান বাচ্চাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখন সময় এসেছে ভারতের মুসলমানরা খোলাখুলিভাবে দারুল উলুমের মতো সংগঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার। আজ যদি আমরা আমাদের অধিকারের কথা না বলি এবং সত্যকে সমর্থন না করি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনোই আমাদের ক্ষমা করবে না। আমাদের মৌনতা এক ধরনের নীরব সমর্থন এবং আমরা যদি এই অন্যায় ঘটতে দেখে নীরব থাকি, তাহলে আমাদের নিজেদের মুসলমান বলার অধিকার নেই। আমরা এমন এক দেশে জন্মেছি যেখানে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হাজারো দেব-দেবীর পূজা হয়। আজকে আমাদের সম্প্রদায় ও আমাদের পয়গম্বরের দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে, কারণ আমরা জেনে-শুনে বা না জেনে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কট্টরবাদকে সমর্থন করছি। যেদিন আমরা সত্যের প্রতি অবিচল হব, সেদিন দারুল উলুমের মতো প্রতিষ্ঠান আমাদের একতা ও সততার কাছে অতি ক্ষুদ্র হয়ে দেখা দেবে।

মানবতা বিরোধী চিন্তাধারার লোকজন বিশেষ করে পাকিস্তানি মানসিকতার দ্বারা পুষ্ট গজবা-এ-হিন্দের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা ভিত্তিহীন।

ভারতের বর্তমান সরকার বৈষম্যহীন ও সমানতার নীতিতে কাজ করে চলেছে। ভারত ক্রমাগত উন্নতি করছে। ভারতের এই পরিস্থিতি কিছু অসামাজিক তত্ত্বের কাছে গ্রহণযোগ নয়।

তাই তারা নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গজবা-এ-হিন্দের মিথ্যা গল্পের উপর নির্ভর করছে, গুজবের সঙ্গে সঙ্গে ভুল তথ্যও ছড়াচ্ছে। তাই গজবা-এ-হিন্দ নিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় এবং যে সব বিদ্বান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, তাদের উচিত কোনো ধারণাকে সমাজের সামনে আনার আগে তার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও যাচাই করা।

(লেখক অধিবক্তা, সুপ্রিম কোর্ট)

শ্রীরামকৃষ্ণলোকে স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ গত ২৬ মার্চ, রাত ৮টা ১৪ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন। পূজনীয় মহারাজ অসংখ্য মানুষকে আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ করেছেন। তাঁর পবিত্র জীবন ত্রিতাপক্লিষ্ট অসংখ্য মানুষকে নবজীবন দান করেছে। পূজনীয় মহারাজের মহাসমাধি সমগ্র ভারত তথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী মানুষের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

খালিস্তানি জঙ্গিদের কাছ থেকে শতাধিক কোটি টাকার অর্থ গ্রহণের অভিযোগ কেজরির বিরুদ্ধে

এই প্রতিবেদন যখন লিখছি, তখন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে ইডির গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে রাজধানীর শাসক দল আপের বিক্ষোভে দিল্লি উত্তাল। আর এই বিক্ষোভের মাঝে কেজরিওয়ালের দেশদ্রোহী কাজকর্ম প্রকাশ্যে এসেছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন মার্কিন-নিবাসী খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিংহ পান্নুন। সম্প্রতি আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এবার খালিস্তানিদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ করল পান্নুন। নিষিদ্ধ 'শিখস ফর জাস্টিস' সংগঠনের প্রধান দাবি করেন, ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত খালিস্তানি সংগঠনগুলির থেকে মোট ১৬ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য পেয়েছে আম আদমি পার্টি। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১৩৩.৫৪ কোটি টাকা।

পান্নুন অভিযোগ করেন, খালিস্তানি জঙ্গি দেবিন্দর পাল সিংহ ভুল্লরকে মুক্তি দেওয়ার বদলে খালিস্তানি সংগঠনগুলির থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য নিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। উল্লেখ্য, এই ভুল্লর ১৯৯৩ সালের দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলযাত্রা হয় তার। সেই হামলায় ন'জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং একত্রিশ জন জখম হয়েছিল। সেই মামলায় প্রাথমিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ভুল্লরকে। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট তার সাজা কমিয়ে আজীবন কারাদণ্ড করে দেয়।

পান্নুন এক ভিডিয়ো বার্তায় অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালে নিউইয়র্কের রিচমন্ডের এক গুরুদ্বারায় খালিস্তানি শিখদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উল্লেখ্য, এ বছরের গোড়ায় জানুয়ারি মাসেও পান্নুন এই একই ধরনের অভিযোগ করেছিলেন। সেই সময় 'শিখস ফর জাস্টিস' নেতা দাবি করেছিলেন, কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিংহ মান কানাডা ও মার্কিন খালিস্তানিদের থেকে ছয় মিলিয়ন ডলার চাঁদা তুলেছিলেন।

'৮৪-র শিখদাঙ্গা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে কালো দাগ হয়ে আছে। যেমন, '৮৫-র এয়ার ইন্ডিয়া বোমা হামলা খালিস্তানিদের জন্য একটি দাগ হয়ে আছে।' পান্নুন, 'ব্যালট নয় বুলেট' নীতি নিয়েই এসএফজে শুরু করেছিলেন। এসএফজের সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো, '২০২০ সালের গণভোট' আয়োজন, যা বিশ্বের বিভিন্ন শহরে প্রবাসী শিখদের মধ্যে ভারত-বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য এই গণভোটের প্রক্রিয়া এবং ফলাফল নিয়ে মিলুস্কি রীতিমতো উপহাস করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'লন্ডনে আমার এক বন্ধু আছেন। যিনি ভোট দেওয়ার অনলাইনে লগ ইন করেন। নিজের নাম দিয়েছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। আর, সফলভাবে ভোট দিয়েছেন। আর তারই ভিত্তিতে পান্নুন ও তাঁর লোকজন গণভোটের সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর যাচাইযোগ্য সংখ্যা প্রকাশ করেছেন।' শুধু তাই নয়। এই গণভোটের মতো নানা বিষয়কে কাজে লাগিয়েই পান্নুন, এসএফজে ভারতের বিরুদ্ধে এবং খালিস্তানের সমর্থনে পর্যায়ক্রমে বিবৃতি দিয়ে প্রচারে রয়েছেন।

এসএফজে হিংসার সমর্থক, এ ব্যাপারে মিলুস্কি বলেন, 'পান্নুন কানাডায় গণভোটের প্রচারাভিযানের সদর দপ্তরের নাম দিয়েছিলেন শহিদ তালবিন্দর সিংহ পারমার ভোটার কেন্দ্র। পারমার, ১৯৮৫-র এয়ার ইন্ডিয়া বোমা হামলার মাস্টারমাইন্ড। ওই বিস্ফোরণে ৩২৯ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। এটি কানাডার ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা।' পান্নুন চলতি মাসে অনলাইনে প্রকাশিত এক ভিডিয়ো ক্লিপে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে শিখদের ১৯ নভেম্বরের পরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান চড়া উচিত হবে না। কারণ, তাতে তাঁদের জীবন সংশয় হতে পারে। তিনি অ-শিখ প্রবাসী ভারতীয়দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা ছাড়তে হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

পান্নুন এবং এসএফজের বিরুদ্ধে পঞ্জাবে তিনটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে উভয়ের বিরুদ্ধে প্রায় ডজনখানেক মামলা আছে। পঞ্জাব পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়াতে এসএফজের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন পোস্টের তালিকা বানিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম, পুলওয়ামা হামলায় কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের কৃষক আন্দোলনের সময়ও জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ পান্নুনের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেছিল। কৃষক আন্দোলনকারীদের আর্থিক উৎস জানতে বিভিন্ন কৃষক নেতা ও কর্মীদের সমন পাঠিয়েছিল। তাঁর সাম্প্রতিক ভিডিয়োতে, 'এয়ার ইন্ডিয়া ১৯৮৫-র পুনরাবৃত্তি' ঘটানোর হুমকি দেওয়ার পরে, এনআইএ পান্নুনের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৬৭-এর অধীনে মামলা করেছে। এনআইএ এবং কেন্দ্রীয় সরকার পান্নুনকে 'জঙ্গি' বলে উল্লেখ করেছে। বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে এসএফজেকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'শিখদের জন্য কথাকথিত গণভোটের আড়ালে, এসএফজে আসলে পঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং জঙ্গি মতাদর্শকে সমর্থন করছে। তারা, বিদেশের মাটিতে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে কাজ করছে। অন্যান্য দেশের শত্রু শক্তি তাদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছে।'

এদিকে ইতিমধ্যেই আবগারি দুনীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিহার জেলে সময় কাটছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। এই গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ করেছে আম আদমি পার্টি। ভোটের মুখে কেজরির গ্রেফতারির বিষয় নিয়ে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে জার্মানি। এর জবাবে ভারত বিষয়টিকে নিজেদের 'অভ্যন্তরীণ মামলা' বলে জানিয়ে দিয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষকে 'নাক না গলানোর' বার্তা দিয়েছে। এই সবের মাঝেই কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ফের একবার খালিস্তানি যোগের অভিযোগ উঠল। এবং অভিযোগ যাঁর কাছ থেকে আসছে, তিনি একজন কুখ্যাত দেশবিরোধী জঙ্গি। সুতরাং তাঁর অভিযোগকেও কেন্দ্রের তদন্তকারীদের তদন্তের আওতায় আনা উচিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ▯

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রয়োগে ভারতীয় মুসলমানদের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলটি সংসদে পাশ হওয়ার পরে ১২ ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সম্মতির পর ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। কিন্তু এই আইনটির প্রয়োগের নিয়মবিধি বহু টালবাহানার পরে ২টি কমিটির সহমতের পরে ২০২৪-এর ১১ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দ্বারা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং ১২ মার্চ থেকে আইন কার্যকর হয়। এই আইনের বলে দেশভাগের বলি লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু উপকৃত হবেন— যাদের নাগরিকত্বের দাবি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মাস থেকে উপেক্ষিত ছিল, অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণার তারিখ থেকে। পরবর্তীকালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে অসমে বিদেশি খেদাও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এক চুক্তির বলে বাংলাদেশ-পরবর্তী উদ্বাস্তুরা অসমে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পরে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনে এনআরসি-র বিষয়টি সংযোজিত হয়। ১৯৭১ সাল ভিত্তিবর্ষ তৈরি হওয়ায় অসমে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েক হাজার ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়।

একটি সমাজসেবী সংগঠন অসমে বহিরাগতদের তাড়াতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এবং আদালতের নির্দেশে অসমের ক্ষেত্রে এনআরসি চালু হয় যাতে প্রমাণ করতে হবে বহিরাগতরা ১৯৭১ সালের আগে অসমে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণে স্বপ্নভঙ্গ হয়ে জীবন ও সম্মান বাঁচাতে যাঁরা দেশত্যাগ করেছেন তাদের এনআরসি-র শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি বলে, এনআরসি-র বাইরে চলে যায় প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ। এদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরম্পরায় বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই দেশভাগের বলি ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে আসা সংখ্যালঘুদের ভারতের মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর একটি নোটিফিকেশন জারি করেন যাতে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আসা উদ্বাস্তুদের ভারতীয় পাসপোর্ট আইন ১৯২০ এবং বিদেশি শনাক্তকরণ আইন ১৯৪৬ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, যাতে তাদের বিদেশি হিসেবে শনাক্ত করা না হয়— এটাই নাগরিকত্ব আইনের ভিত্তিভূমি।

> **পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব বিধি চালু করার ঘটনায় হিংসায় জ্বলছেন। তিনি কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব লাভের প্রয়াসী উদ্বাস্তুদের ভয় দেখাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ হারানোর।**

ব্রিটিশ প্রতিনিধি র‍্যাডক্লিফের দ্বারা ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় (র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ) দেশভাগের ফলে ভারত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মুখোমুখি হবে, গান্ধীজী তা অনুমান করতে পেরে স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) একমাস আগে নয়াদিল্লিতে তাঁর প্রার্থনা সভার সমাপ্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই বলেন : ‘যেসব হিন্দু ভয়ে, বাস্তব বা কল্পিত, যাই হোক না কেন, পাকিস্তান থেকে ঘর ছেড়ে চলে আসবে— তাদের সমস্যা আছে। তাদের দৈনন্দিন কাজে ও চলাফেরার পথে যদি বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়— নিজেদের দেশে তাদের সঙ্গে যদি পরবাসী বলে আচরণ করা হয়, তাহলে সেখানে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সীমান্তের এপারে সংলগ্ন রাজ্যের কর্তব্য হবে তাদের সাদরে গ্রহণ করে সবরকম ন্যায্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া। একথা যেন তাদের মনে না আসে, যে তাঁরা বিদেশে এসেছেন।’ (১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ)। গান্ধীর এই উপলব্ধির পিছনে ১৯৪৬ সালের নোয়াখালি দাঙ্গার পরে সেখানে ৩ মাস অবস্থানের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। আধুনিক গান্ধীবাদীরা ভারতে বসবাস করে উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা বুঝবেন না, বুঝলেও রাজনৈতিক স্বার্থ তাদের বাস্তববিমুখ করে রেখেছে।

একটি মহল বলছে, সংশোধিত নাগরিক আইনটি ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী। ২০১৯ সালে নাগরিক আইনটি সংশোধিত হওয়ার আগেও ১৯৫০ সালের নাগরিক আইনটি সময়ের বিবর্তনে বারবার

ফঃ ২

সংশোধিত হয়েছে। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য ১৯৫৫ সালে ব্যাপক রদবদল হয় আইনটিতে। আইনটিতে বর্তমানে যা আছে তার প্রাসঙ্গিক দিকগুলি আলোচনা করা যাক :

১. দ্বিজাতিতত্ত্বে ভাগ হওয়া ভারতে যে সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থেকে গেলেন, তাঁরা অন্যান্যদের মতোই ভারতের নাগরিক। দেশভাগের পরে পাকিস্তানে চলে গিয়ে থাকলেও ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি-র মধ্যে ভারতে ফিরে এলে— তারা ভারতের নাগরিক।

২. ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ১৯৮৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ভারতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক মুসলমান অন্যান্যদের মতো ভারতের নাগরিক।

৩. ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতে জন্মলাভ করা প্রত্যেকটি শিশু (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) ভারতের নাগরিক হবে, যদি তাদের মা-বাবার যে কোনো একজন ভারতের নাগরিক হয়।

৪. এরপরে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দু'জনকেই ভারতের নাগরিক অথবা একজন ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যজন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী নন এমন হতে হবে। এক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম।

৫. জন্মসূত্র বাদেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভারতের নাগরিক হওয়া যায়— অন্যান্য বিদেশিদের ক্ষেত্রে যে নিয়ম মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাই। গত ৫ বছরে ৩৭৪২ জনকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান (পাকিস্তানি/ আফগান)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্তমান নাগরিকত্ব আইনেও কোনো বৈষম্য নেই। ভারতীয় মুসলমানরা তো বটেই, এমনকী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের গরিষ্ঠাংশ জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ২০১৯-এর সংশোধনীটি আনা হয়েছে শুধুমাত্র রিফিউজিদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদানুসারে UNHRC (United Nations Commission for Human Rights) এবং Uruguay Protocol অনুযায়ী জাতিদাঙ্গা বা ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে বা নির্যাতনের ভয়ে দেশত্যাগীরা যে দেশে আশ্রয় নিয়ে ফেলে আসা দেশে ফিরতে চান না, তারাই সে দেশে রিফিউজি বা উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য হবেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বা তাদের স্বীকৃতির অভিপ্রায় ২০১৯-এর নাগরিকত্ব আইনে পাকিস্তান, বাংলদেশ ও আফগানিস্তান থেকে দেশত্যাগী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ ও পার্সিদের নাগরিকত্ব প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। ভারতের কোনো নাগরিক— তিনি যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন, এই আইনের আওতার বাইরে, এই আইনে কারুর নাগরিকত্ব হরনের ধারা নেই। গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় সংসদে পাশ হওয়া এই আইনটি স্বাধীনতা প্রাক্কালে জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই আইনটিকে গায়ের জোরে রুখে দেওয়ার আস্ফালন অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী।

ভারতের উত্তর-পূর্বে জনজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলির জনভিত্তি অপরিবর্তনীয় রাখতে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশকে এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে মেঘালয়, অসম ও ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাসমূহ বা স্বশাসিত এলাকাগুলি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের আওতাধীন নয়। অথচ স্রেফ রাজনৈতিক বিরোধিতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে লোকসভা ভোটে ফায়দা তুলতে, আইনটি সম্পর্কে কল্পনাপ্রসূত অপপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছে অনেক বিরোধী দল। ফলে মানবিক মুখ প্রদর্শন এবং জাতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার মতো দিকগুলি চাপা পড়ে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বামদলগুলি ভোটের আগে এই সংশোধনীটি কার্যকর করার সমালোচনা করছে, অথচ এই আইনটি এত বিলম্বেও চালু না হলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে কাঠগড়ায় তোলা হতো বিজেপিকে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, নানা রকম কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে আবেদনকারীদের কাছে, তাতে জটিলতা আছে, অসম্পূর্ণ কাগজের জন্য কারুর আবেদন অগ্রাহ্য হলে কী হবে? বাংলাদেশে নির্যাতিত হয়েছেন তার প্রমাণ কীভাবে দেবেন ইত্যাদি কল্পিত প্রশ্ন তুলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। এ সম্পর্কে এই পর্যায় এটুকু বলা চলে— আইনটি চালু হয়েছে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, প্রত্যাখ্যানের জন্য নয়, ছোটোখাটো জটিলতা অভিজ্ঞতার আলোকে দূরীভূত হবে। আর বাংলাদেশের কোনো কাগজের প্রয়োজন হবে না, ফর্মে হলফনামা দেওয়ার বিধান রয়েছে। আর নাগরিকত্ব আইনে পূর্ববর্তী দেশে নির্যাতনের প্রমাণের কোনো ধারা নেই। নির্যাতিত বা নির্যাতনের ভয়ে দেশত্যাগের কথা রয়েছে, যা হলফনামায় দেওয়া যাবে।

সর্বোপরি, নাগরিকত্বের আবেদন করার কোনো সময়সীমা নেই, প্রয়োজনমতো নাগরিকত্ব না নিলেও আইনত তিনি কিন্তু এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে সুরক্ষিত। তাদের অসমের মতো এনআরসি জুজু দেখানো যাবে না। যারা সিএএ-র সঙ্গে এনআরসি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তারা সাধারণ মানুষকে বোকা--- আর নিজেদের বিজ্ঞ মনে করছেন। বরং সিএএ হচ্ছে এনআরসি-র প্রতিষেধক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব বিধি চালু করার ঘটনায় হিংসায় জ্বলছেন। তিনি কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব লাভের প্রয়াসী উদ্বাস্তুদের ভয় দেখাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ হারানোর। এখন উদ্বাস্তুরাই ঠিক করবেন তাঁরা অপাংক্তেয়, পরবাসী বা পরজীবীর তকমা থেকে মর্যাদা ও নাগরিক সত্তাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কিনা। অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গে কোনোদিন এনআরসি চালু হলে এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনই উদ্বাস্তুদের রক্ষাকবচের কাজ করবে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯ (সিএএ)

উদ্বাস্তুদের মাথা উঁচু করে বাঁচার আইন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বহু প্রতীক্ষিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ গত ১১ মার্চ ২০২৪ সোমবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিক ভাবে সারাদেশে লাগু করেছে কেন্দ্র সরকার। আইন পাশ হওয়ার দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর তা কার্যকর করা হলো। ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সিএএ বিল লোকসভায় পাশ হয়। ১১ ডিসেম্বর সেটি পাশ হয় রাজ্যসভায় এবং ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সেই বিলটিতে সই করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি আইনে পরিণত হয়। এবার সেই আইনকেই দেশজুড়ে কার্যকর করা হলো।

এবারে দেখে নেওয়া যাক এই আইনে কার কী লাভ বা ক্ষতি হবে। এই আইনের ফলে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত সে দেশের সংখ্যালঘু নাগরিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, পার্সি ও জৈন শরণার্থীরা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসে থাকলে তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। নাগরিকত্ব পাওয়ার ফলে তাঁরা এদেশে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অবাধ চলাচলের পাশাপাশি সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকারও পাবেন। এই আইনে এদেশীয় মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে না বা অসুবিধায় পড়তে হবে না। এটি নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, কেড়ে নেওয়ার আইন নয়।

সিএএ কার্যকর হওয়ার খবর ছড়াতেই উচ্ছ্বাসে, আনন্দে মেতে উঠেছেন ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা উদ্বাস্তুরা। সিএএ লাগু হওয়াতে শুধু বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা নয়, অত্যন্ত খুশি হয়েছেন পাকিস্তানি হিন্দুরাও যারা পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে এসে বসবাস করছেন।

গুটিকতক দেশ বিরোধী রাজনৈতিক দলের চিৎকারে দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়ে দেশের সুরক্ষা, দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার দিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখা জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সঠিক।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সবসময় মিথ্যা কথা প্রচার করতে অভ্যস্ত, তিনি পুনরায় সিএএ-র বিরুদ্ধে অসত্য ভাষণে বলেছেন (১১ মার্চ, ২০২৪) যে, 'বৈধ নাগরিকদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে।' যদিও ওই পদে থেকে ভুয়ো খবর ছড়ানো যায় না। তিনি আরও বলেছেন— 'এই আইনে নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন করলে সব হারানোর সম্ভাবনা।' অথচ তিনি নিজে এক সময় এই আইন প্রণয়নের জন্য এবং দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের দাবিতে নথিপত্র ছুঁড়েছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষকে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, 'দেশের ১৮ কোটি মুসলমান নাগরিকদের ওপর সিএএ-র কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।' রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেছেন— 'সিএএ কার্যকর হওয়ায় কোনও মুসলমান যদি বিপদে পড়েন, আমি তার পাশে থাকব।' তিনি আরও বলেছেন,

‘সিএএ কার্যকর হওয়ায় কোনও অশান্তি হবে না। মুসলমানরা বুঝেছেন, এটা কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, স্বীকৃত পদে থেকে বলছি, একজন মুসলমানও যদি কোনও অসুবিধায় পড়েন, তাহলে আপনার জন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আছে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ভুল বুঝিয়ে মানুষ ক্ষেপানোর চেষ্টা করছে। এই আইন সম্পূর্ণ ভাবে উদ্বাস্তু হিন্দুদের সমনাগরিকত্বের আইন। কারও কাছ থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভিটেমাটি ছেড়ে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, পার্সিরা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বহু বছর ধরে তাঁরা সপরিবারে অসহায়ভাবে ভারতে বসবাস করছেন। কিন্তু তাঁদের নাগরিকত্বের বিষয়টি ঝুলে ছিল। কংগ্রেস দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও এর সুরাহা করে যায়নি। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া সমাজকে নাগরিকত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেইমতো ২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার সেই লক্ষ্যে সিএএ পাশ করিয়ে নিয়েছিল। আর এবার ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে দেশজুড়ে সিএএ লাগু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জুটি উদ্বাস্তুদের মন জয় করে নিয়েছেন।

এবারে একটু পিছন ফিরে দেখে নেওয়া যাক। দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ শতাংশ আর পূর্ব অংশে ছিল ২৯ শতাংশ। তখন থেকে পশ্চিম অংশে হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচারের ফলে হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে ৭৬ বছরে ৮ শতাংশ থেকে কমে ১ শতাংশে নেমে এসেছে। আর পূর্ব অংশে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৯ শতাংশ হিন্দু অত্যাচারের ফলে কমতে কমতে ১৯ শতাংশে নেমেছিল। ১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠিত হলেও সেদেশের হিন্দুদের ভাগ্য ফেরেনি। তাই ১৯৭১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ হিন্দু কমতে কমতে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বলেছিলেন যে, ‘যেহারে বাংলাদেশ থেকে দৈনিক হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাতে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে।’ স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে ওদেশের হিন্দুরা কোথায় যাচ্ছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যা উঠে আসছে তা হলো— বিভিন্ন অজুহাতে কিছু সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করা হয়, কিছু সংখ্যককে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয় আর কিছু সংখ্যক ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। এই সমস্ত পালিয়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্যই সিএএ আইন প্রণয়ন, যা অত্যন্ত জরুরি ছিল।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় এলে বিশেষ করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর ইশারায় বাংলাদেশ থেকে মুসলমানদের ডেকে এনে তাদের রেশনকার্ড, ভোটারকার্ড প্রভৃতি সরকারি নথি প্রদান করে ওই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার বানিয়ে দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্ষমতা ভোগ করেছে বামফ্রন্ট। সেই সময় বিরোধী নেত্রী তথা আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন সব থেকে বেশি। এমনকী ২০০৫ সালে অনুপ্রবেশকারীদের তথ্য সংবলিত কাগজপত্র লোকসভার অধ্যক্ষের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং এখনও অনেক সংবাদ চ্যানেলে দেখা যায়।

২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের নিজের দলের বিশ্বস্ত ভোটার করে তাদের দ্বারা যত রকমের অসামাজিক কাজ করানো যায় সেই ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে সিপিএমের ওই সমস্ত সম্পদ— শেখ শাজাহান, আরাবুল ইসলাম, শওকত মোল্লারা এখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর আদরের দুধেল গাই। সরকারি মদতে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অবৈধ রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের। যার ফলে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর ডেমোগ্রাফি বদলে গিয়ে কত যে সন্দেশখালি তৈরি হয়ে আছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া মুশকিল।

সিএএ লাগু হওয়ার পর বিরোধীদের সোচ্চার হওয়ার প্রধান কারণ হলো এই আইনের বলে রাজ্যের স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমানদের কোনো অসুবিধা না হলেও ওইসব অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং তাদের দেশ থেকে তাড়ানো সহজ হবে। এদের দেশ থেকে তাড়ালে হিন্দু এবং স্থানীয় মুসলমানরা নিশ্চিন্তে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। তাতেই ক্ষতি হবে ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলোর। তাই তাদের চিলচিৎকার শুরু হয়েছে।

দেশবাসীকে মনে রাখতে হবে, গুটিকতক দেশ বিরোধী রাজনৈতিক দলের চিৎকারে দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়ে দেশের সুরক্ষা, দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার দিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখা সবচেয়ে জরুরি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত। ◻

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

অনলাইনে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া

ধর্মানন্দ দেব

বাড়িতেই বসে অনলাইনে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। গত ১১ মার্চ সন্ধ্যায় নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কার্যকর হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকার একটি অনলাইন পোর্টালও চালু করেছে। যে পোর্টালের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই অনলাইনে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কীভাবে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে, কী কী নথি লাগবে, আপনি কি সেই নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করছি—

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর হলো গোটা দেশজুড়ে। লোকসভা ভোটের মুখে মোদী সরকারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যাঁরা আবেদন করতে চান, তাঁদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা ফর্ম। যেমন, শিশুদের ক্ষেত্রে আলাদা ফর্ম, অন্য দেশ থেকে এসে আবেদন করলে আলাদা ফর্ম। আবার বাবা বা মা, কেউ ভারতীয় বলে যাঁরা নাগরিকত্বের দাবি জানাতে চান তাঁদের জন্য পৃথক আবেদনের প্রক্রিয়া। এমন সাত রকমের ফর্ম রয়েছে।

এখন দেখে নেওয়া অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতি। অনলাইনে আবেদন করার জন্য https://indiancitizenshiponline.nic.in/ ওয়েবসাইটের হোমপেজেই দেওয়া হয়েছে আবেদন লিঙ্ক। অথবা সরাসরি https://indiancitizenshiponline.nic.in/Login লিংকে ক্লিক করেও আবেদন করা যেতে পারে। আবেদনের সময় দিতে হবে নিজের কাছে থাকা সক্রিয় মোবাইল নম্বর অথবা ইমেইল আইডি। দিতে হবে ক্যাপচা কোড। পরবর্তী পর্যায়ে নিজের নাম এবং ইমেইল আইডি দিয়ে ফের ক্যাপচা কোড দিতে হবে। এরপর আপনার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডিতে একটি ওটিপি পাঠানো হবে। যে ওটিপি নির্দিষ্ট জায়গায় দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে একটি নতুন পেজ খুলে যাবে। কারা আবেদন করতে পারবেন, কী কী নথি লাগবে, পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য পড়ে নিতে হবে। তারপর 'অ্যাপ্লাই অনলাইন'-এ ক্লিক করতে হবে আবেদনকারীদের। পরে একটি নতুন পেজ খুলে যাবে। সেই পেজের শুরুতেই একটি 'টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশন আইডি' থাকবে (ধরা যাক-021111202420056LPZM1)। সেটা লিখতে হবে। তারপর যাবতীয় তথ্য পূরণ করতে হবে আবেদনকারীদের। অনেক কিছু তথ্য দিতে হবে। ক্লিক করতে হবে 'সেভ অ্যান্ড নেক্সট' বাটনে। এভাবেই একে-একে ঠিকানা, পরিবার, অপরাধ সংক্রান্ত ইতিহাসের তথ্য দিতে হবে। তারপর আসবে 'ফোটো/ডক্যুমেন্টস'-র জায়গা। সেখানে নিজের ও নথির ছবি আপলোড করতে হবে। 'আপলোড ফটো' অপশনে গিয়ে আবেদনকারীর ছবি আপলোড করতে হবে। আপনি যে যে তথ্য দিয়েছেন, তা সঠিক হয়েছে কিনা, সেটা দেখার জন্য 'ভিউ অ্যাপ্লিকেশন'-এ ক্লিক করতে হবে আবেদনকারীদের। যদি সবকিছু ঠিক থাকে, তাহলে 'ফাইনাল সাবমিট টু দ্য মিনিস্ট্রি' বাটনে ক্লিক করতে হবে। যে প্রক্রিয়ার পরে আবেদনপত্রে কোনও ভুল থাকলেও আর সংশোধন করা যাবে না। 'ফাইনাল সাবমিট টু দ্য মিনিস্ট্রি' বাটনে ক্লিক করার পরে একটি 'এমএইচএ ফাইল নাম্বার' (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফাইল নম্বর) জেনারেট হবে। সেই নম্বর রেখে দিতে হবে আবেদনকারীদের। যে 'ডায়লগ বক্সে' ওই নম্বর দেখাবে, তা 'ক্লোজ' করে নথি আপলোড করতে হবে। স্ক্যান করা পিডিএফ নথি লাগবে। সেই নথি আপলোড হয়ে যাওয়ার পরে 'প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন' বাটনটা কার্যকর হবে। তারপর প্রিন্ট-আউট করে রেখে দিতে হবে নিজের আবেদনপত্র।

এবার 'অনলাইন পেমেন্ট'-এর ট্যাবে যেতে হবে। সেখানে আবেদনকারীর নাম, ফর্ম, টাকা এমএইচএ ফাইল নম্বর থাকবে। নীচেই 'পেমেন্ট গেটওয়ে'-র 'পেমেন্ট' আছে। তাতে ক্লিক করতে হবে। অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাংকিঙের মাধ্যমে টাকা দিতে পারবেন। টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া সফল হলে একটি রশিদ মিলবে। সেটা নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। অনলাইনে যে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন এবং সেটার সমর্থনে বিভিন্ন নথি জমা দিতে হবে জেলাশাসক বা ডেপুটি কমিশনারের অফিসে। যদি নাগরিকত্বের আবেদন গৃহীত হয়, তাহলে আবেদনপত্রে দেওয়া ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠানো হবে। সেইসঙ্গে রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি ও মোবাইল নম্বরে পাঠানো হবে বার্তা। সেই চিঠি পাওয়ার পরে indiancitizenshiponline.nic.in-তে গিয়ে নিজের ক্যাটেগরি অনুযায়ী 'Form X' বা 'Form XI' বা 'Form XII' পূরণ করতে হবে এবং জেলাশাসকের অফিসে সব অরিজিনাল কপি জমা দিতে হবে। আবেদনকারীদের ক্লিক করতে হবে 'Apply Form X/XII' বাটনে। (১১) তারপর আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। 'Modify/Print Form X/XII' বাটনে ক্লিক করতে হবে তাঁদের। রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিতে ওটিপি আসবে। সেটা 'Submit and Continue'-তে ক্লিক করতে হবে।

পরে একটি নয়া পেজ খুলে যাবে। সেখানে যাবতীয় তথ্য পূরণ করে 'Save and Next' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এবার আবেদনকারীর ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে। আপলোড করার পরে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য 'Form X Final submit to the Ministry'-তে ক্লিক করতে হবে প্রার্থীদের। 'Close' বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং অনলাইন ফি জমা দিতে হবে। অনলাইনে টাকা দেওয়ার পরে পূরণ করা ফর্মটা নিয়ে গিয়ে জেলাশাসকের অফিসে জমা দিতে হবে আবেদনকারীদের। সঙ্গে অরিজিনাল সার্টিফিকেট, টাকা দেওয়ার রশিদ, ছবি, স্বাক্ষর-সহ যাবতীয় নথি নিয়ে যেতে হবে। যদি নাগরিকত্বের আবেদন গৃহীত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা জেলাশাসকের কাছে তাঁর নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এখন আমরা দেখে নিই উপরোক্ত পক্রিয়া মেনে আবেদন করতে হলে কি কি নথির প্রয়োজন। নতুন নাগরিকত্ব রুলসে নথির উল্লেখ আমরা পাই তিনটি তপশিলে, সেগুলি হচ্ছে— তপশিল-১ক, তপশিল-১খ এবং তপশিল-১গ। তপশিল-১ক-তে উল্লেখ করা

নথিগুলি নিম্নরূপ :

১. আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারি করা পাসপোর্টের অনুলিপি।

২. ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অথবা ভারতে ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক জারিকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা আবাসিক পারমিট।

৩. আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা জন্ম শংসাপত্র।

৪. আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের স্কুল সার্টিফিকেট বা স্কুল বা কলেজ বা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা জারি করা শিক্ষাগত শংসাপত্র।

৫. আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বা অন্যকোনো সরকারি এজেন্সি কর্তৃক জারি করা যে কোনো ধরনের পরিচয় নথি।

৬. আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা যে কোনো লাইসেন্স বা শংসাপত্র।

৭. আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে জমি বা প্রজাস্বত্ব রেকর্ড।

৮. যে কোনো নথি যা দেখায় যে আবেদনকারীর পিতা-মাতা বা দাদা-দাদির মধ্যে একজন আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের তিনটি দেশের যে কোনো একটির নাগরিক ছিলেন।

৯. পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা দ্বারা জারি করা অন্য কোনো নথি যা নিশ্চিত করবে যে আবেদনকারী আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ছিলেন।

মনে রাখতে হবে, উপরোক্ত নথিগুলি তাদের বৈধতার মেয়াদের পরেও গ্রহণযোগ্য হবে।

আবেদনকারী ৩১.১২.২০১৪ ইংরেজি তারিখে বা তার আগে ভারতে প্রবেশ করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য নথির তালিকা দেওয়া হয়েছে তপশিল-১খ-তে। সেগুলির মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে দাখিল করতে হবে। নথিগুলি হচ্ছে :

১. ভারতে আগমনের সময় ভিসা এবং ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্পের কপি।

২. ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অথবা ভারতে ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক জারিকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা আবাসিক পারমিট।

৩. জনগণনা পরিচালনা করার সময় এই ধরনের ব্যক্তিদের ভারতে জনগণনাকারীদের দ্বারা জারি করা স্লিপ।

৪. ভারতে সরকার দ্বারা জারি করা লাইসেন্স বা শংসাপত্র বা পারমিট (ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধার কার্ড ইত্যাদি-সহ)।

৫. ভারতে জারি করা আবেদনকারীর রেশন কার্ড।

৬. সরকারি স্ট্যাম্প-সহ আবেদনকারীকে সরকার বা আদালত কর্তৃক জারি করা যে কোনো চিঠি।

৭. ভারতে জারি করা আবেদনকারীর জন্ম শংসাপত্র।

৮. আবেদনকারীর নামে ভারতে জমি বা ভাড়ার রেকর্ড বা নিবন্ধিত ভাড়া চুক্তি।

৯. প্যান কার্ড ইস্যুকরণ নথি যা ইস্যু করার তারিখ বহন করে।

১০. কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা যে কোনো পাবলিক সেক্টর দ্বারা জারি করা অন্য কোনো নথি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা ব্যাংক বা অন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ।

১১. কোনো গ্রামীণ বা শহুরে সংস্থার নির্বাচিত সদস্য বা তার কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক জারি করা শংসাপত্র।

১২. ব্যাংক (বেসরকারি ব্যাংক-সহ) বা পোস্ট অফিসের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং জারি করা রেকর্ড এবং অ্যাকাউন্টের বিবরণ আবেদনকারীর নামে অ্যাকাউন্ট।

১৩. আবেদনকারীর নামে ভারতে বীমা কোম্পানি দ্বারা জারি করা বীমা পলিসি।

১৪. আবেদনকারীর নামে বিদ্যুৎ সংযোগের কাগজপত্র বা বিদ্যুৎ বিল বা অন্যান্য ইউটিলিটি বিল।

১৫. আবেদনকারীর বিষয়ে ভারতে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রেকর্ড বা প্রক্রিয়া।

১৬. কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড দ্বারা সমর্থিত ভারতে যে কোনো নিয়োগকর্তার অধীনে পরিষেবা বা কর্মসংস্থান দেখানো নথি তহবিল (ইপিএফ)/সাধারণ ভবিষ্য তহবিল/পেনশন/কর্মচারীদের রাজ্য বিমা কর্পোরেশন (ইএসআইসি) নথি।

১৭. ভারতে জারি করা আবেদনকারীর স্কুল ছাড়ার শংসাপত্র।

১৮. একটি স্কুল বা কলেজ বা একটি বোর্ড বা একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা জারি করা অ্যাকাডেমিক শংসাপত্র।

১৯. আবেদনকারীকে পৌরসভার ট্রেড ইস্যু করা লাইসেন্স হয়েছে।

২০. বিবাহের শংসাপত্র বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

দ্রষ্টব্য :

(১) উপরের নথিগুলি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি হওয়া উচিত এবং এমনকী গ্রহণযোগ্য হবে তাদের বৈধতার সময়সীমা অতিক্রম করে।

(২) নথিগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে আবেদনকারী ৩১.১২.২০১৪ ইংরেজি তারিখে বা তার আগে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

তপশিল ১ক ও ১খ-তে বর্ণিত নথির যে কোনো একটি করে নথি অর্থাৎ এই দুটি নথির সঙ্গে তপশিল ১গ-তে উল্লেখ করা শপথনামাটি দাখিল করিতে হবে। শপথনামায় সেই দেশের সম্পূর্ণ পোস্টাল ঠিকানা দিতে হবে এবং ভারতে প্রবেশের তারিখ, সাল ও মাস দিতে হবে।

সিএএ বিধি, ২০২৪ অনুযায়ী এই প্রতিবেদনে বর্ণিত ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে তারা সক্ষম হবেন যাদের কাছে আবেদনের উপযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট নথি আছে। কিন্তু ভারতে আশ্রয় নেওয়া যে শরণার্থীদের কাছে উপরোক্ত নথিগুলি নেই, তাদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে সিএএ বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনীয় ভারত সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ। একথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নিজেই জানিয়েছেন। ***(লেখক একজন আইনজীবী)***

ভ্রম সংশোধন

গত ৪ মার্চ সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠায় ২য় কলামের ২য় স্তবকে 'ধুমপানের' স্থানে 'ধুমধামের' পড়তে হবে।

— স্বঃ সঃ

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের লোগো নিয়ে বিতর্ক অহেতুক ও অন্যায্য

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ৩৩ সদস্যের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশাদারদের নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২০-র ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্বতন মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নাম বদলে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন নাম রাখা হয়েছে। এক বছর আগে এর লোগো পরিবর্তন করা হয়েছে। তখন প্রতিবাদ হয়নি। সম্প্রতি সেই লোগোকে সাদাকালো থেকে রঙিন করা হয়েছে এর দৃশ্যমানতা বাড়াবার জন্য। তারপর শুরু হয়েছে বিতর্ক। এর আগে ছিল গ্রিক চিকিৎসা দেবতা অ্যাসলেপিয়াসের ছবি। তাঁর জায়গায় এসেছে ধন্বন্তরীর ছবি। যদি কোনো একজন দেবতাকেই মানা যায় তবে কেন ভিনদেশি দেবতা? আমাদের ভারতীয় চিকিৎসার দেবতা নয় কেন? এটাই তো অন্যায় যে ৮৭ বছর আমরা এটা হতে দিয়েছি। তবে এখন কেন শোরগোল? তাই ডাক্তারদের একটা বেসরকারি নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর কেরালা অধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারি নিয়ন্ত্রককে চিঠি দিয়ে বলেছে যে লোগোটি ‘আধুনিক চিকিৎসক সঙ্ঘের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নতুন লোগো ভুল বার্তা দেয় এবং কমিশনের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির ক্ষতি করবে।’ এটা সম্পূর্ণ কুযুক্তি।

ভারতীয় অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকরা পাশ্চাত্য অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় পারদর্শী হলেও কলোনিয়াল হ্যাংওভারের এক বিচিত্র প্রভাব তাদের মতাদর্শে পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক বর্তমানে এই প্রভাবমুক্ত হলেও চিকিৎসক সমাজের কিয়দংশ এখনও এই প্রভাব হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। উপরন্তু ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কেরালা চ্যাপ্টারে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কিছু চিকিৎসকের সমাবেশও বিশেষ লক্ষণীয়। বিদেশি মত ও পথের অন্ধ অনুকরণকারী ও সমর্থক, চিকিৎসক নামধারী এহেন বিদেশি ধারণার তল্পিবাহক একটি অংশের থেকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের এই নতুন লোগোর বিরোধিতা তাই হয়তো আশাতীত নয়। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস বিস্মরণ, প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়নে অনীহা, ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব এই আপত্তি দাখিলের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রতীত।

ভারতীয় পুরাণ অনুসারে ঋষি ধন্বন্তরী সমুদ্র মন্থনের শেষে পবিত্র অমৃত হাতে আবির্ভূত হন। অমরত্ব লাভের জন্য অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরে দীর্ঘকাল বিবাদ হয়েছিল। এই ধন্বন্তরী দেবতাদের চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত এবং কিছু প্রাচীন গ্রন্থে সৃষ্টির রক্ষাকর্তা ভগবান বিষ্ণুর পার্থিব অবতার হিসেবে বিবেচিত হন। ঐশ্বরিক অবতার রূপে আদি-ধন্বন্তরী

নামেও পরিচিত।

ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। যা খেলে বা পান করলে রোগ নিরাময় হয় তাই অমৃত অর্থাৎ যা আমাদের মৃত্যু রোধ করে। আক্ষরিকভাবে অমর কেউ হয় না তবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায় যথার্থ চিকিৎসার দ্বারা। এটাই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে পুরাণের লৌকিক ব্যাখ্যা। সবাইকে সেই অর্থেই নিতে হবে। আবার মানুষকে বাঁচাতে না পারলে সৃষ্টি রক্ষা হয় না। তাই ধন্বন্তরীকে সৃষ্টির রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর পার্থিব অবতার মানা হয়েছে। অবতাররা সবাই মানুষ এবং তাঁদের অসাধারণ জনকল্যাণমুখী গুণের কারণে তাঁদের দেবত্বে উন্নীত করা হয়। ঠিক যে ভাবে রক্তমাংসের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান মানা হয় বা বহু আগের গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার ধরা হয়। অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভক্তির কারণে মানুষকে ঈশ্বরের পুত্র, দূত বা অবতার বলে মানা হয়। চীনে অনেক সম্রাটকে এই কারণেই দেবতা মানা হয়।

ধন্বন্তরী এমনই একজন মানুষ। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান ঐতিহাসিক নথিগুলো উপলব্ধ নয়। আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা ভারতের প্রাচীন পুঁথি ও স্থাপত্য-সহ সব নিদর্শন ধ্বংস করেছে। আটটা বৃহৎ গ্রন্থাগার তুর্কি-আফগান-মুঘলরা ধ্বংস করেছে। আরও অসংখ্য গ্রন্থাগার ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিলুপ্ত হয়েছে। বেদাদি অতি উচ্চমানের গ্রন্থরচনা অতি উন্নত সভ্যতার পরিচয়বাহী। আমাদের প্রচুর পুঁথি ও নথি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমাদের যা আছে তার ভিত্তিতে বলতে পারি আয়ুর্বেদ বলে একটা গ্রন্থ আছে তো? সেটাতে যা আছে তার ভুলঠিক বিচার পরের কথা। তবে নিশ্চয় কেউ সেটা লিখেছিলেন!

ধন্বন্তরীকেই আয়ুর্বেদের মূল প্রণেতা মানা হয়, তাঁকে এই স্তোত্রগুলি মানব জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন কাশী রাজ্যের পৌরাণিক রাজা দিবোদাসকে তাঁর অবতার মানা হয়। তিনি আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঋষিদের কাছে এসেছিলেন এবং তারপর তিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। ধন্বন্তরীকে বিষ্ণু পুরাণে দিবোদাসের প্রপিতামহ রূপেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

তাঁর বিশেষত্ব ছিল শল্যচিকিৎসা। সুশ্রুত ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান শেখানোর অনুরোধ নিয়ে মহান ভারতীয় সার্জন সুশ্রুত-সহ একদল ঋষি তাঁর কাছে আসেন। ধন্বন্তরী বলেছিলেন যে ব্রহ্মা মানবজাতি সৃষ্টির আগেই আয়ুর্বেদ রচনা করেছেন, ১০০, ০০০টি অধ্যায়ে সাজানো ১০০,০০০ শ্লোকে অথর্ববেদের একটি উপাঙ্গ গঠন করেছিলেন, যা মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তা ও স্বল্পায়ুর কারণে শেখা সহজ ছিল না। তাই ধন্বন্তরী ঋষিদের অনুরোধ মেনে ব্রহ্মার আয়ুর্বেদকে ৮টি ভাগে (শল্য, শালখ্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগড়তন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজিকরণতন্ত্র) পুনর্বিন্যাস করেন এবং প্রত্যক্ষ (উপলব্ধি), আগম (অনুমোদিত শাস্ত্র), অনুমান এবং উপমানের কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। অন্যত্র শাস্ত্রে আছে, 'যে ধন্বন্তরীর নাম স্মরণ করে, সে সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পায়।' ভগবান ইন্দ্র মানবজাতিকে যন্ত্রণা ও রোগে আক্রান্ত দেখে ধন্বন্তরীর কাছে জড়জগতে অবতরণ করার এবং মানবজাতিকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

আরেক জায়গায় আছে, কাশীর রাজা দীর্ঘতম কঠোর তপস্যা করছিলেন। ভগবান ধন্বন্তরী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি পুত্র দান করবেন বলে কথা দেন। রাজার ভক্তিতে খুশি হয়ে কাশীরাজ গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋষি ও দ্রষ্টাদের মৌখিকভাবে আয়ুর্বেদ শিখিয়েছিলেন যারা তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুলো অগ্নি পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে, সেইসঙ্গে তাঁর শিষ্য সুশ্রুত, পৌষকালাবত, অরভ, বৈতরণ এবং অন্যান্যদের লেখার মাধ্যমেও সেগুলো পাই। ধনত্রয়োদশীর দিনে ধন্বন্তরীর জন্মদিন সারা ভারতে পালন করেন আয়ুর্বেদ অনুশীলনকারীরা। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু ও কেরালায় কিছু মন্দির ধন্বন্তরীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই মন্দিরগুলোতে ধন্বন্তরী জয়ন্তী অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালিত হয়। আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলন অফিসে দিল্লির ধন্বন্তরী ভবনে আয়ুর্বেদ অনুশীলনকারীরা ধন্বন্তরীর বড়ো মূর্তির পূজা করেন।

পুরাণ ছেড়ে আমরা এবার লৌকিক বাস্তবের ধন্বন্তরীর দিকে তাকাব। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। এই নবরত্নরা হলেন অমরসিংহ (সংস্কৃত অভিধানকার এবং একজন কবি), শঙ্কু (স্থপতি), বরাহমিহির (জ্যোতির্বিদ), বররুচি (ব্যাকরণবিদ, সংস্কৃত), হরিসেন (প্রয়াগ প্রশস্তির রচয়িতা ও বিশিষ্ট কবি), কালিদাস (মহাকবি ও মহান নাট্যকার), ক্ষপণক (জোতিষশাস্ত্রী) ও বেতালভট্ট (জাদুকর ও ঐন্দ্রজালিক)। কাজেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঙ্গত। একেবারে না হওয়ার থেকে দেরিতে হওয়া ভালো। আয়ুর্বেদের অনেক কিছু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। ▯

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

নতুন ভাবনা

গত ১৭ এপ্রিল স্বস্তিকায় মতামত কলামে রামব্রহ্ম দেবশর্মা লিখিত 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর রায় দিন' শীর্ষক প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্রের অবতারণা। প্রতিবেদনটি সময়োপযোগী, যুক্তিনির্ভর ও তথ্যপূর্ণ। আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক নোটা-তে বোতাম টেপা কেন অনুচিত--- এ ব্যাপারেও যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য উত্থাপন করেছেন। তবে নোটা-কে নিয়ে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি অবতারণা করার পরও অতিরিক্ত একটি বড়ো সুযোগের উল্লেখ করা যেতেই পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্বাচন প্রক্রিয়াও পরিবর্তনযোগ্য। আগে নোটার ব্যবহার ছিল না, সম্প্রতি সংযোজিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো নির্বাচনে শুধু একজন প্রার্থীই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়ে যান। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অযোগ্য ও নিকৃষ্ট প্রার্থী জিতে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু নোটা সক্রিয় থাকলেও প্রয়োগ করা গেল না। তাই নির্বাচন কমিশনের নিকট দাবি উত্থাপন করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে একক প্রার্থীকে নোটার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যোগ্যতার প্রমাণ করা উচিত। অর্থাৎ একজন প্রার্থী থাকলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যুক্তি গ্রাহ্য।

—**জহরলাল পাল,**
শিলচর, অসম।

বাম-তৃণু আমলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বেআইনি নির্মাণ

গত ১৭ মার্চ রাতে কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় একটি পাঁচ তলা নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই ঘটনায় ১১ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়েছে। কলকাতা পুরসভা এলাকা জুড়ে অসংখ্য বেআইনি নির্মাণ গত কয়েক দশক ধরেই হয়ে চলেছে। ৩৪ বছর ধরে শাসক বামফ্রন্ট এবং তারপর ১৩ বছর ধরে বর্তমান শাসক দলের নেতৃত্বাধীন শাসনে— পুলিশ-পার্টি (অর্থাৎ শাসক দল)-প্রোমোটার-পুরসভার এক অশুভ চক্রের কালো ছায়া কলকাতা জুড়ে বিরাজ করছে। কলকাতা পুর এলাকা এবং বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত পুরসভাগুলিতে অসংখ্য জলাজমি ভরাট করে বেআইনি নির্মাণের রমরমা চলছে। এর ফলে এই এলাকাগুলির জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র যেমন ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছে, তেমনই এলাকাগুলিতে আগামীদিনে ঘনিয়ে উঠতে পারে তীব্র জলসংকট।

ক্রমাগত জলাজমি বুজিয়ে ফেলার ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে তার প্রভাব পড়ছে। কোনো রকম কনভার্শন, মিউটেশনের কাগজপত্র বা ভূমি দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, এনজিটির এনওসি বা ছাড় পত্র এই বাড়িগুলির নেই। শাসক দলের এলাকা ভিত্তিক সিন্ডিকেটের দৌলতে নিম্নমানের বিল্ডিং মেটিরিয়ালস্ (ইট-বালি-পাথর-সিমেন্ট-লোহা ইত্যাদি) ব্যবহার করে ব্যাপক মুনাফা রেখে এক শ্রেণীর অসাধু প্রোমোটার বা ডেভেলপাররা প্রতিটি এলাকায় এই বাড়িগুলি তৈরি করে চলেছেন। মজবুত ভিত না থাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিফেক্টে ভর্তি এবং আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদের তৈরি অধিকাংশ বাড়ির কোনো সিসি বা বিল্ডিং কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নেই। এই অবৈধ নির্মাণগুলির পেছনে সক্রিয় মদত হলো বাড়িগুলির প্রতিটা তলের স্কোয়্যার ফুট মেপে তোলাবাজিতে সিদ্ধহস্ত স্থানীয় কাউন্সিলর এবং স্থানীয় থানার ওসিদের। এর ফলশ্রুতিতে এই কাউন্সিলররা আজ চড়েন কোটি কোটি টাকার বিলাসবহুল অডি বা মার্সিডিজ গাড়ি বা বিদেশ ভ্রমণে অহরহ পৌঁছে যান ইউরোপ বা দুবাই। শহর জুড়ে সক্রিয় এই মাফিয়া চক্রের কার্যকলাপের বলি সাধারণ মানুষ হলেও খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজ বা গার্ডেনরীচের মতো এলাকাগুলির পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ।

এই বেআইনি বাড়িগুলির বিদ্যুৎ সংযোগ চলে হুকিং করে। সিইএসসির ক্ষমতা নেই এই হুকিং আটকানোর। বাড়ির নীচে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার তৈরি না করে পুরসভার জলের লাইন থেকে সরাসরি পাম্প করে ছাদের ট্যাংকে জল ওঠে এই বাড়িগুলিতে, যা বন্ধের ক্ষমতা পুরসভার নেই। অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট ও এনজিটির একাধিক রায় থাকলেও তা কার্যকরে অপারগ কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশ। এই অবৈধ কংক্রিটের জঙ্গল সরাতে ব্যর্থ এই অপদার্থ প্রশাসন, আর চরম দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলের এই জঘন্য নেক্সাসের এক চরম পরিণাম আগামীদিনে কলকাতাবাসী ও কলকাতা শহরতলির জনতার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজের ডান হাত রূপী কাউন্সিলরকে বাঁচাতে বিল্ডিং বিভাগের এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারকে বলির পাঁঠা করে মেয়র নিজের মুখোশটা যেন আরেক বার নিজেই টেনে খুললেন।

—**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,**
খড়দহ।

রাজনীতিতে সেলিব্রিটিরা কেন?

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সেলিব্রিটি হবার প্রয়োজন--- একালীন রাজনীতির ধারা প্রসঙ্গে একথাই বলা যায়। কিন্তু বিজেপি প্রসঙ্গে এই ধারাটির পরিবর্তন আসন্ন। সায়ন্তিকা ও রচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি বলাই যায়--- একজন সত্যিকারের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল— কিন্তু রাজনীতি নামক বস্তুটি কী আজব বস্তু! একথাটি ভালোভাবেই বুঝে যাবেন সায়ন্তিকা, যেমনটি ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন মিনি চক্রবর্তী এবং দীপক অধিকারীরা। ঝুমঝুম ব্যানার্জি খুবই সেলিব্রিটি এখন এবং তাঁরও এই সেলিব্রিটির চেহারা কীরকম বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে, এটাই এখন দেখার।

ফঃ ৩

অতীতে মুনমুন-তাপসেরা কীরকম অবস্থায় পড়েছেন, তাও আমরা দেখেছি। এখনও মুনমুন জীবিত কিন্তু তাঁর নামটি মমতাদেবী ভুলেও চিন্তা করেন না। শতাব্দী রায়ও একই পথের পথিক--- তাঁর সেলিব্রেটির সঙ্গে মানসিক তৃপ্তি ও অহংকার কী ভীষণ জরুরি, তা তিনি অনুভব করেছেন কিন্তু একথা বলার পর্যন্ত অবস্থায় নেই 'সিনেমায় যদি আমাকে দেখতে হয় তার জন্যও পয়সার দরকার কিন্তু রাজনীতিতে আমার কারণে আমায় দেখার জন্য কোনো পয়সাও লাগছে না!' এবং তিনি কি সেকথাটিও স্মরণে রাখবেন। কারণ এর মধ্যেই তিনি ঝিমিয়ে গেছেন তাই নয় কি? গায়ক সেলিব্রিটি বাবুল সুপ্রিয় প্রথম একাদশে খেলার জন্যই রাজনীতিতে এসেছিলেন। লোকসভা ভোটের পর তিনি যে কততম ব্যক্তি হয়ে যান সেটাও দেখার বিষয়!

—**দীপক খাঁ,**
পাটপুর, বাঁকুড়া।

ভোটতাণ্ডব

এবারের লোকসভা ভোট নিয়ে সরগরম 'সারা বাংলা তৃণমূল' এবারে মমতাময়ী নয় ক্ষমতাময়ী শাসন জারি করে ভোটের বাজার উত্তপ্ত রাখতে মরিয়া। আনকোরা নং ওয়ান দিদিদের নিয়ে এবারের লোকসভায় ছাপ্পা মেরে পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতা জারি রাখতে যতরকমের কারচুপি/জালিয়াতি অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। হুগলীর এক দিদি নেত্রী বলেছেন সন্দেশখালি ব্যাপারটা সেইরকম কোনো সমস্যা নয়। সবটাই মানুষের হাতে। আবার বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুমাতা বলেছেন 'বড়ে বড়ে দেশে অ্যায়সে ছোটো ছোটো ঘটনা হোতে ব্যাহেতে হ্যায়।'

এই সমস্ত উক্তিকে সাধারণ মানুষ ঘৃণার সঙ্গে ও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, এনারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। হায়রে বিধাতা! এরা কি ভুল করছে জানে না, এনাদের ক্ষমা করো।

লজ্জা বলে একটা শব্দ আছে যেটা এদের বিন্দুমাত্র নেই। প্রত্যেকবার নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নাটকীয়তা মানুষ আর নিতে পারছেন না, পর্দার আড়ালে অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে। নির্বাচনের আগেই এমপি-এমএলএ-দের ও দলবদল হচ্ছে প্রত্যেকবার। এসবই পূর্বপরিকল্পিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের যুবসমাজকে রাজনীতি নয়, রাষ্ট্রনীতি শেখানো উচিত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লোভ দেখিয়ে রাজনীতির ছত্রছায়ায় এনে দেশের যুবসমাজকে অবক্ষয়ের মুখে ফেলে দেশকে অবনতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। প্রচার করো, ঝান্ডা ধরো, দেওয়াল লেখো, টাকা দেবো--- এই করেই দেশের যুবসমাজকে হাতের মুঠোয় করে নির্বাচনের সময়ে নোংরা খেলায় মেতে ওঠে। নোংরা খেলা খেলছে রাজ্যবাসীকে নিয়ে নির্বাচনের অগ্নিকন্যা, লক্ষ্মী ভাণ্ডারে বশ করে সাধারণ মানুষকে অসামাজিক করে তুলেছে।

এবারে আসুক পরিবর্তন। এ বঙ্গের বুকে বাতাসের রং হোক গেরুয়া। মনের মিছিল হোক গেরুয়া, বাজুক রণদুন্দুভি। নির্বাচনের রণভূমিতে জয়ী হোক গেরুয়া বর্ণের। মানুষ হোক জাগ্রত, গেরুয়া আবিরে স্বাগত হোক আগামীর পশ্চিমবঙ্গ। বিনাশ হোক বিষাক্ত তৃণের। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হোক একটাই স্লোগান— 'হর হর মোদী, ঘর ঘর মোদী'।

—**সম্রাট শীল,**
বরানগর।

শ্রীমদ্ভগদগীতা পাঠের আগ্রহ বাড়ছে

গত ১৭ মার্চ কোচবিহার পুরানো পোস্ট অফিস পাড়া মাঠে গীতা পাঠ ও বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার লোকের উপস্থিতি ছিল। অধিকাংশই ছিল স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠের শেষে ভাষণ রাখলেন দেব চক্রবর্তী। তারপর গীতা বিতরণ আনুষ্ঠানিকভাবে করা হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির কয়েকজন মুসলমান ছাত্রী। তারাও সাগ্রহে গীতা গ্রহণ করলেন। অতপর সভাপতি শ্রীমদ্ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করলেন এবং ভাষণে বললেন, যে নিজেই নিজেকে জয় করেছে, সে নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে নিজেকে জয় করতে পারেনি সে নিজেই নিজের শত্রু।

আমি মনে করি এই বাক্যটি বালক থেকে বৃদ্ধ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাস্তব উদাহরণ হিসেবে আমি তুলে ধরেছি, গত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সংবাদ উত্তরবঙ্গ সংবাদে পড়ে তারিখে ব্রাসেলসে দাঙ্গা, প্যারিসে ভাঙচুর, বাংলাদেশে বারো জনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে আমি স্বস্তিকা পত্রিকায় একটি লেখা পাঠালাম 'স্কুলে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ প্রয়োজন কেন'। লেখাটি ১৬.০১.২২ প্রকাশিত হয়। আবার ১৬.১২.২০২১ তারিখে আমার লেখা 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম'। প্রশ্ন এসে যায়, সনাতন ধর্মের লোক এতো অহিংস কেন? মনু সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৯২নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিনিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাঃ সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।

সে মর্মে বিশ্ব শান্তির প্রেক্ষাপটে সনাতন ধর্ম ও গীতা পাঠের আগ্রহ বাড়ছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেব হাট, রাশিডাঙ্গা-২।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

স্ব-বোধ এবং মাতৃশক্তি

সুতপা বসাক ভড়

১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অথচ একটু যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদে দেশ খণ্ডিত হয়েছে। একটি সমস্যা জর্জরিত দেশ তার নাম বিদেশিদের দেওয়া 'ইন্ডিয়া'। এখন সমস্যা হলো, বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, এই আত্মতুষ্টিতে মগ্ন ছিলাম।

কত কয়েক বছর ধরে আমরা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি। আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? আমাদের দেশের নাম কি ইন্ডিয়া? আমরা কি নিজেদের মতো করে চলি বা চলতে পারি? আমরা কি কারুর হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছি?

প্রথমে দেখি, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীন ঘোষিত হয়েছি কিন্তু স্ব-তন্ত্র, স্ব-দেশ আমরা পাইনি। আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের স্ব-তন্ত্র, স্ব-শিক্ষা, স্ব-ভাষা, স্ব-ভূষা, স্ব-ধর্ম, স্ব-বিবেক, স্ব-নির্ণয়, স্ব-সুরক্ষা, স্ব-নির্ভরতা, স্ব-সংস্কৃতি ইত্যাদি। আমাদের ইন্ডিয়ান হিসেবে থাকতে, ভাবতে বাধ্য করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন হলো যত শীঘ্র সম্ভব আমদের ইন্ডিয়ান ঝেড়ে ফেলে ভারতীয় হয়ে উঠা। তাহলেই আমরা আমাদের স্ব-কে অনুধাবন করব।

কোনো একটি দেশকে মানসিকভাবে পরাধীন করতে চাইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ওই দেশের প্রাচীন নামটি বদলে ফেলা। বিদেশি শাসকদের একটি কূটনৈতিক পন্থা। এরপর তারা সেই দেশের সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে। কোনো দেশের সংস্কৃতি যদি নষ্ট হয়ে যায়, শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ড একটি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; সেজন্য বর্তমানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই ভূখণ্ডের স্ব-নাম এবং স্ব-সংস্কৃতি বজায় রাখা। আমাদের এই ভারতভূমি হলো আধ্যাত্মিক ভূমি। এখানকার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক চেতনা দ্বারা। এই আধ্যাত্মিক চেতনা ধরে রেখেছে আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি। আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি চিরপুরাতন কিন্তু চিরনতুন। আমরা সকল প্রকার ভালো জিনিসকে আমাদের মধ্যে সহজেই আত্মসাৎ করে থাকি, আমাদের স্ব-ধর্ম বজায় রেখে।

এখন একটু ভাবি, স্বাধীন ভারতে আমরা প্রধানত কোন ভাষায় কথা বলা উচিত? স্ব-ভাষা অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব ভাষা— উদাহরণস্বরূপ বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়, তামিল, তেলুগু, মরাঠি ইত্যাদি। যখন আমরা একই ভাষাভাষীর মানুষ কথা বলি, তখনও আমরা যাদের দ্বারা শাসিত হয়েছি, অত্যাচারিত হয়েছি, পদদলিত হয়েছি, ঘৃণিত হয়েছি, তাদের ভাষায় বাক্যালাপ করি; তখন আমাদের কোন মনোভাব প্রকাশিত হয়? বিদেশি শাসকদের ভাষা কেন আমরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই? কেন আমরা ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে কোনো ভারতীয় ভাষায় বাক্যালাপ করতে হীনম্মন্যতায় ভুগি এবং পরাণুকরণের মনোভাব আমরা আমাদের ব্যবহারের মাধ্যমে বারবার প্রকাশ করতে থাকি?

বিদেশি মনোভাবাপন্ন শাসকদের দ্বারা প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আমরা মহিলারা বাড়িতে পরিবারের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং আমাদের ইতিহাস নিয়মিতভাবে আলোচনা করি কিনা। আমাদের গৌরবময় অতীত আমাদের বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। সেজন্য জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে বাড়ির পরিবেশে আমরা যেন স্ব-শিক্ষায় (আমাদের নিজস্ব শিক্ষায়) শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারি।

স্ব-ভূষা অর্থাৎ নিজস্ব পোশাক। আমাদের পারম্পরিক পোশাককে সর্বক্ষেত্রে সম্মান জানানো প্রয়োজন। আমরা বিদেশি পোশাকের অনুকরণ করে স্ব-ভূষা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' কি আমরা নিরর্থক করে ফেলব?

'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'— নিজ ধর্ম পালন করলে, ধর্ম আমাদের রক্ষা করবে। নিজের বিবেকের কণ্ঠস্বরে প্রভাবিত হয়ে স্ব-নির্ণয় নেব আমরা। আমরা রক্ষা করব আমাদের সংস্কৃতি। আমরা পালন করব শারদোৎসব নয়, দুর্গাপূজা; ভ্যালেন্টাইন ডে নয়, সরস্বতী পূজা; বসন্ত উৎসব নয়, দোলযাত্রা। নিজেদের মধ্যে স্ব-এর চেতনা জাগ্রত করে আমরা মহিলারা আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্ব-বোধের অভ্যুত্থানের অন্যতম রূপকার হবার আন্তরিক প্রয়াস করব। □

আর্থ্রাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আর্থ্রাইটিস বা বাত পুরোপুরি কিওর হয়তো হয় না তবে সামলে রাখা যায়। এটা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হতে পারে। উভয়ের ক্ষেত্রেই ৪০ বছরের পর থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এই রোগ প্রকাশ পায়। পুরুষদের থেকে একটু হলেও বেশি ভোগেন মহিলারা। আর একবার হলেই ধীরে ধীরে গোটা শরীরেই তার প্রভাব পড়তে পারে। তখন এই রোগ থেকে মুক্তির কোনও পথ পাওয়া যায় না।

সাধারণভাবে হাঁটুতে, পায়ে ও কোমরে বাতের ব্যথা হতে পারে। অনেক সময়ই পায়ের আঙুল থেকে ব্যথা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আর্থ্রাইটিসের জন্য মানুষ একেবারে শয্যাশায়ী পর্যন্ত হতে পারে।

জিনগত বা নিজের দোষেই : বাত সাধারণ দু'টি কারণে হতে পারে। জিনগত কারণে অথবা নিজের দোষে। কারণ যাই হোক অল্প বয়স থেকে সচেতনতাই সুস্থ থাকার প্রাথমিক শর্ত। তাই ছোটো থেকেই সুস্থ জীবনযাপন বজায় রাখলে এড়ানো সম্ভব বাতের অসহ্য যন্ত্রণা। যদি কারও অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয় তাদের ওষুধেও কাজ হয় না। তবে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস হলে ওষুধ ও ব্যায়ামে কিছুটা হলেও অসহ্য যন্ত্রণাকে সামাল দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নিত্যদিনের খাদ্যাভাসের দিকেও।

ওজন কমানো জরুরি : সাধারণভাবে যাঁরা মোটা তাঁদের আর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। তাই ধরা পড়লেই প্রথমে ওজন কমাতে হবে। তবে না খেয়ে নয়।

শরীর চর্চাতেই সমাধান লুকিয়ে : সুষম খাবার যেমন খেতে হবে তেমনই প্রয়োজন শরীর চর্চা করা।

- সকাল বা সন্ধ্যায় অন্তত ১০ থেকে ২০ মিনিট হাঁটতে হবে। পারলে হালকা জগিং করা যেতে পারে। তবে বেশি হাঁটলে বা জগিঙের সময় ব্যথা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। প্রয়োজনে হাঁটার সময় কমিয়ে আনা ভালো।
- অফিসে লিফটে নয়, সিঁড়িতে ওঠার অভ্যাস করতে হবে। আরও ভালো হয় অফিসে যাওয়ার পথে কিছু পথ হেঁটে গেলে।
- ঘুম থেকে উঠে হালকা ব্যায়াম করতে হবে। জিমে গিয়েও গা-ঘামানো যেতে পারে।
- শরীরচর্চা করতে না পারলেও ভোরে বা রাতে অল্প সময় হলেও যোগ বা প্রাণায়াম করা জরুরি।
- যাদের হাঁটুতে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা তাঁদের জন্য সাঁতার কাটা খুব উপকারী। সাইকেল চালানোও ভালো।

এক কথায় বলতে গেলে, সারাক্ষণ 'আক্টিভ' থাকতে হবে। কিছু না কিছু কাজের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু কখনও ভারী কিছু তোলা বা শরীরে বেশি কষ্ট দিয়ে কোনও কাজ করা চলবে না।

কার্বোহাইড্রেট খাবার একেবারেই নয় : প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে একটা 'ডায়েট চার্ট' তৈরি করে নেওয়া ভালো। সেখানে অতি অবশ্যই ভাত বা রুটিকে যতটা সম্ভব তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। কেননা, এই দুটো খাবারে কার্বোহাইড্রেট থাকে। রুটি খেলেও তা একবার খান এবং সংখ্যায় খুব কম।

ভরসার ভিটামিন 'ডি' : দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম হতে শুরু করলেই হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বাত। তাই ভিটামিন 'ডি' রয়েছে, এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে অল্প বয়স থেকেই। রোগ বা ব্যথা ধরে গেলে সেই সময়েও ওই ধরনের খাবার বেশি করে খেতে হবে। ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার সব পাতেই ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার যেমন শাকসবজি প্রচুর খেতে হবে। দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া জরুরি। মাটির নীচের সবজি যেমন— মুলো, বিট অবশ্যই খেতে হবে। অল্প হলেও দিব্যি খাওয়া যেতে পারে সামুদ্রিক মাছও। বেশি চিনি খাওয়া চলবে না। বেশি চিনিযুক্ত হেলথ্ ড্রিঙ্ক যতটা সম্ভব কম খাওয়াই ভালো।

জাংকফুট একেবারেই নয় : আর্থ্রাইটিস ধরা পড়লে জাংকফুট না খাওয়াই ভালো। কেননা, ওজন বাড়াতে জাংকফুড ভীষণ বিপজ্জনক। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, জাংকফুড ছোটো বয়স থেকেই কম খাওয়া শরীরের জন্য সবদিক থেকেই ভালো। এছাড়া ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার আর্থ্রাইটিসকে বশে রাখতে উপকারী। ফ্যাটজাতীয় খাবার খাবেন না।

মদ্যপান ও ধূমপান করবেন না : আর্থ্রাইটিস ধরা পড়লে একেবারে বাদ দিন মদ্যপান। সিগারেট বা বিড়িও বাদের তালিকায়। কেননা, মদ্যপান, ধূমপান শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমায়। বেশি ধূমপান বা মদ খেলে আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম শুকিয়ে যায়। ফলে হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। তাই এই অসুখ দেখা দিলে তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবন করবেন না।

একটানা বসে থাকা নয় : অফিসে হোক বা বাড়িতে, কখনও একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা চলবে না। অন্ততপক্ষে এক ঘণ্টা কাজ করলে মিনিট দশেক একটু হেঁটে আসা ভালো। তেমন হলে কম্পিউটারের কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সিট থেকে উঠে হাত-পা একটু হালকা দোলানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ। □

সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের ভ্রান্তিবিলাস

সঞ্জীব রায়

দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৫ যা কিনা ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিটি ল অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তা আইন হিসেবে পরিচিত। এই আইনটি লাগু হয়েছিল ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৫। এই আইনে ভারতীয় নাগরিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। এবারে আমাদের জানা দরকার দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৫, এই আইনে কী বলা আছে। এই আইনে মূলত বলা আছে একজন ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে :

১. ভারতে জন্মসূত্রে সে নাগরিক হতে পারে।

২. পূর্বপুরুষের সূত্রে সে নাগরিক হতে পারে।

৩. রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্বের আবেদন করে জাতীয় পঞ্জীকরণ রেজিস্টার ভুক্ত হয়ে নাগরিক হতে পারে। যার কিনা পূর্বপুরুষ এ দেশে ছিল।

৪.দীর্ঘদিন এদেশে থাকার সূত্রে নাগরিক হতে পারে।

৫. ভারত সরকার যদি কোনো অঞ্চলকে নিজের দেশের অন্তর্ভুক্তিকরণ করে নেয় তবে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিক বলে পরিগণিত হবে।

৬. অসম চুক্তির ফলে কোনো ব্যক্তিকে সেই চুক্তিতে উল্লেখিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

এখন আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসবে অসম অ্যাকর্ড কী? অসম অ্যাকর্ড বা অসম চুক্তি হলো ১৯৮৫ সালে ভারত সরকার এবং অসম আন্দোলন নেতৃত্বের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে অসম আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই চুক্তিতে মূলত বলা হয়েছিল যে—

১. ১ জানুয়ারি ১৯৬৬ তারিখের আগে আসা বা স্থানীয় অধিবাসী অথবা যাদের নাম ১৯৬৭-র নির্বাচনী তালিকাতে ছিল তাদের বিধিসম্মত নির্ভুল ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ধরা হবে।

২. যে সমস্ত বহিরাগত ১ জানুয়ারি

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৭১-এর মধ্যে বিদেশ থেকে অসমে এসেছেন, তারা ১৯৪৬-এর বিদেশি শনাক্তকরণ আইন ও ১৯৬৪-এর বিদেশি ট্রাইব্যুনাল আইনের আওতাভুক্ত হবে।

৩. বিদেশি হিসেবে তালিকাবদ্ধদের শনাক্ত করে নির্বাচনী ভোটার তালিকা থেকে নাম বহিষ্করণ করা চালু থাকবে। বিদেশি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯৩৯ এবং বিদেশি নিবন্ধন নীতি, ১৯৩৯ অনুযায়ী, প্রত্যেক সন্দেহভাজন অনাগরিক সংশ্লিষ্ট জেলার নাগরিকত্ব নিবন্ধন কার্যালয়ে আপিল করতে পারেন নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করার জন্য।

৪. বিদেশি হিসেবে শনাক্তকরণের ১০ বছর অতিক্রম হওয়ার পর নির্বাচনী তালিকা থেকে বহিষ্কার করা নামগুলি পুনরায় বিবেচনার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হবে।

অসমের প্রতিবাদের কারণগুলি হলো—

অসম চুক্তি অনুযায়ী, যদি অসমের কোনো বাসিন্দা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে নিজের অথবা পূর্বপুরুষের বসবাসের প্রমাণ দিতে পারেন, তবে তিনি গণ্য হবেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে। কিন্তু সেখানে সিএএ-এর দৌলতে এনআরসি-র সময়সীমা বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪।

দেশভাগের পর দুটি পৃথক দেশ হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান গঠনের পরে দুদেশে বিপরীত ধর্মাবলম্বী মানুষদের সম্পত্তি লুটপাট এবং বিভিন্ন প্রকার উৎপীড়ন যখন একটি সমস্যার আকার ধারণ করেছে, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও নবগঠিত পাকিস্তান দুই দেশের সরকারের তরফে ১৯৫০ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। যা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে খ্যাত।

এর মধ্যে সবথেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর এই দেশভাগের সব থেকে বেশি প্রভাব পড়ে। ভারতে থাকা মুসলমানদের উপরও হয় কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। তবে তার পরিমাণ ছিল গুরুত্বের দিক থেকে খুবই নগণ্য। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়া ও সংখ্যালঘুদের নিরাপদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বিষয়ে সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে ভারত ও পাকিস্তান সহমতের জায়গায় পৌঁছোয়। এটাই ছিল চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই চুক্তি ভারতবর্ষে কার্যকর হলেও পাকিস্তানে তা কার্যকর হয়নি। পাকিস্তানে চুক্তিটি সঠিকভাবে কার্যকর হতে না পারার কারণে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই ভারতবর্ষে সিএএ-এর মতো আইন লাগুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আরও বেশি করে।

নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ থেকে এ যাবৎকাল অবধি পাঁচবার সংশোধিত হয়েছে

আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট বা নাগরিকত্ব আইনের কিছু সংশোধন ও সংযোজন বিভিন্ন সময় হয়েছিল।

(ক) ১৯৮৬ : এখানে বলা হয়েছে জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে জুলাই ১৯৮৭-এর মধ্যে যারা যারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

(খ) ২০০৩ : কোনো ব্যক্তিকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে যদি তার বাবা-মা ভারতের নাগরিক হন অথবা তাদের মধ্যে কেউ একজন ভারতের নাগরিক হন।

(গ) ২০০৫ এবং ২০১৫-তে পর্যায়ক্রমে সংশোধনীর মাধ্যমে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

(ঘ) ২০১৯ : বর্তমান সিএএ আইনটি ২০১৯ সালে আইনে রূপায়িত হয়। বলা হয় ৬টি সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি, খ্রিস্টান, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যারা কি না বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে চায়, তাদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে।

পুরো দেশ এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে যখন দেশভাগ হয় ধর্মীয় কারণে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, যা কিনা এক সময় ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরবর্তীকালে এইসব দেশে ইসলামের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা চালু হয়। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুসলমান ভিন্ন অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যখন বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, যাদের দীর্ঘদিন ধরে কোনোরকম ভারতীয় নাগরিকত্ব ছিল না এবং ভারতবর্ষে যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল; তাদেরকে নাগরিকত্বের আওতার মধ্যে আনার জন্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রথম থেকে সিএএ লাগু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। আজকে সেই আইন কার্যকর হয়েছে, দেশেভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় নির্যাতিতদের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে।

এই আইনের সঙ্গে মুসলমানদের কী সম্পর্ক?

১. এই আইনের সঙ্গে মুসলিমদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

২. দেশ ভাগ হয়েছিল ধর্মের

ভিত্তিতে। সেই সময় মুসলমানদের দাবি ছিল তারা ধর্মের লোকেরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না এবং নিজেদের আলাদা দেশ গঠনের দাবি তোলে এবং বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

৩. সেই সময় ২৪.৩৩ শতাংশ মুসলমান প্রায় ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ড নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান সেই জনসংখ্যার মধ্যে আবার ১৩ শতাংশ ভারতবর্ষে রয়ে গিয়েছিল।

৪. কিন্তু এখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশভাগের পরেও রয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে কোনোরকম অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো বাধা তৈরি না হলেও, নতুন পাকিস্তানে এবং পরবর্তীকালে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠিত বর্তমান বাংলাদেশে বা পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে, বিভিন্ন রকম অত্যাচারের কারণে।

৫. যে সকল মুসলমান এদেশে থাকতে পারবে না বলে, পাকিস্তানে চলে যায়, তাদের পুনরায় ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু উলটোদিকে এই কথা বলে আশ্বস্ত করা যায় যে, ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে বসবাসকারী মুসলমানদের ক্ষেত্রে কোনো রকম বিপদের কারণ নেই। বর্তমান আইন অনুযায়ী যেহেতু তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং আইনের শর্তগুলি তারা পূরণ করতে সফল হচ্ছে।

৬. এরপরেও যারা কিনা প্রতিবেশী পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে এসে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক কারণে বসবাস করছেন, তাদের নিয়ম মাফিক ভিসা বা পাসপোর্টের মাধ্যমে অভিবাসন দপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তারা ভারতবর্ষে বসবাস করতে পারবে।

কী বলা আছে সিএএ আইনে

১. প্রথমত সিএএ নাগরিকত্ব কেড়ে নেবার আইন নয়; বরঞ্চ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন।

২. এই আইনের পরিষ্কারভাবে বলা আছে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সেই সকল দেশের ছটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ছিন্নমূল মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য এবং ভারতবর্ষে তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই আইন প্রস্তুত করা হয়েছে!

৩. মানবিক কারণে ভারত সরকার এই সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লোকেদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই আইন প্রণয়ন করেছেন।

কিন্তু সিএএ নিয়ে এত শোরগোল কেন?

এই আইনের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শোরগোলের কারণগুলো হলো—

১. মূলত অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে এদেশে বেআইনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যে চালিয়ে যাচ্ছিল সেটি এখন থেকে আর সম্ভব হবে না আইনের চোখে।

২. মুসলমান অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে এসে এদেশের অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করার যে সুযোগ পাচ্ছিল, সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

৩. ইসলামি দেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে এদেশে অপরাধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে এই আইনের ফলে সহজ ও নিরাপদ সুযোগটি তারা হারাতে বসেছে, তা তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

৪. অন্য দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এদেশে রোহিঙ্গারা যে কলোনি খুলে বসেছিল এবং এদেশে সমস্ত রকম অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এখন থেকে তা আর সম্ভব হবে না এবং সেই সকল রোহিঙ্গাকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে।

৫. সহজে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করার কাজটি এখন থেকে আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি চিৎকারের কারণ কী?

১. পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এক সময় সংসদে সাংসদ হিসেবে নাগরিকত্ব আইন চালু করার জন্য স্পিকারের মুখের সামনে কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তিনি আজ এই আইনের বিরোধিতা করছেন।

২. কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরাও এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে কাজে লাগিয়ে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে। সেই কারণে তারাও এই বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত মূলত স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক কারণে।

৩. কমিউনিস্টরা যারা কিনা সোহরাবর্দি সরকারকে সমর্থন জানিয়েছিল এক সময় এবং সমগ্র বঙ্গ ও পঞ্জাবকেই পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। তারা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ভোটার কার্ড রেশন কার্ড দিয়ে, দেশভাগের পরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে থাকার সুযোগ করে দিয়ে, নিজেদের ৩৪ বছরের রাজত্ব পাকা করেছিল। তার সবথেকে বড়ো উদাহরণ হলো বর্তমানের সন্দেশখালির সন্ত্রাস শেখ শাজাহানের মতো লোকেরা। তারা জানে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের একটি বড়ো অংশ তাদের ভোটব্যাংক। যা তাদের হারাতে হবে এই আইন লাগুর পরে। এই কারণে কমিউনিস্টদের বিচলিত হওয়াটা স্বাভাবিক।

৪. সিএএ লাগু হবার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এতটাই বিচলিত যে তিনি ভারতীয় আইনের বিরুদ্ধাচারণ করে সংখ্যালঘু মানুষদের উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করার এক

অসাধু খেলায় মেতেছেন। তার একমাত্র কারণ হলো নিজের অবৈধ ভোটব্যাংক হারানোর অমোঘ ভয়।

৫. এছাড়াও এর পিছনে রয়েছে বিদেশি চক্রান্তকারীরা। যারা সংখ্যালঘুদের দিয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে শোরগোল তৈরি করতে চাইছে এই কারণে যে, বিদেশি ইসলামি সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বিন্যাসের একটা পরিবর্তনের যে দীর্ঘদিনের কর্মসূচি চালাচ্ছিল, তা ব্যাহত হবে জেনে তারা বিচলিত বোধ করছেন।

সিএএ-র পক্ষে আমাদের মতামত জানানোর ক্ষেত্রে যে আখ্যান বা ন্যারেটিভগুলি উপস্থাপিত করা উচিত তা এই রকম যে :

১. দেশ ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। সুতরাং মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের অবাধে ভারতবর্ষে ঢুকতে দিয়ে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে দেওয়া, একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে ভারত করতে পারে না।

২. ভারতবর্ষকে লেবানন হতে দেওয়া যাবে না। যে লেবানন একসময় ছিল স্বর্গরাজ্য এবং সেখানে সব থেকে প্রাচীনতম খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল। এই লেবাননে একসময় শ্যুটিং হয়েছিল ভারতীয় সিনেমা— 'অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস'-এর।

কিন্তু পরবর্তীকালে লেবাননে ইসলামি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এবং তাদের জন্ম সংখ্যা হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেই দেশের জনসংখ্যা বিন্যাসের এক আমূল পরিবর্তন ঘটে।

এর ফলে দেশে একসময় জন্ম নিল উগ্রপন্থা। উগ্রপন্থার হাত ধরে এক সময় প্যালেস্তাইনি উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দেওয়ার দরজা খুলে দেওয়া হলো সেই দেশে। সে দেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করলো জেহাদি মানসিকতা। সেখানে প্রশাসন অগণিত খ্রিস্টানদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি বা সেই অবস্থা সমাধানের কোনো স্থায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। একটা সময় বহু খ্রিস্টান লেবানন ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হলো। সেই লেবাননে ১৯৭০ সালে ৬০ শতাংশ খ্রিস্টান জনসংখ্যার থেকে নেমে দাঁড়ালো এখন ৩০ শতাংশে। পরবর্তীকালে একই রকম ঘটনা ঘটেছে সিরিয়াতেও।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে কী বলা হয়েছিল?

এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে 'ধর্মের ভিত্তিতে' ভারত বিভাজনের ফলে সৃষ্ট দু'দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু যারা নিজের ধর্মের দেশে ফিরে আসতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে—

- বর্তমানে কোনো ব্যক্তি যে দেশে অবস্থান করছে সেই দেশে নিজ সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে।
- তাদের বাড়ির মহিলাদের যারা লুট করেছিল তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে।
- যার সম্পত্তি লুট হয়েছিল সেই লুট করা সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে সম্পত্তির মালিককে।
- জোর করে ধর্মান্তর করানো যাবে না।
- সংখ্যালঘু আইন কার্যকর করতে হবে।

দুঃখের বিষয় ভারতের সংখ্যালঘু আইন ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলেও এবং নেহরু-লিয়াকত চুক্তি মানা হলেও পাকিস্তানে এর কোনোটি মানা হয়নি এবং সংখ্যালঘুদের মর্যাদা রক্ষা করার কোনো সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এটি হলো ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের একটি কৌশল। ভারতবর্ষকে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের শিকার হতে দেওয়া যাবে না।

৩. যেদিন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে একের পর এক হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে। তাদের দেশান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়েছে, ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তি লুঠ করা হয়েছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধর্মাচরণে তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে; সেদিন পৃথিবীর কোনো প্রান্ত থেকে এর প্রতিবাদে কোনো চিৎকার শোনা যায়নি। আজ যখন ভারতবর্ষ তার নিজের অধিকার, নিজের দেশকে, নিজের সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করার কাজে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এই সিএএ আইন লাগুর বিরুদ্ধে চিৎকার— এক প্রকার অন্যায় চিৎকার! অভিসন্ধিমূলক চিৎকার! পক্ষপাতমূলক চিৎকার! ভারতকে দুর্বল করার অভিসন্ধিমূলক চিৎকার! কিন্তু আসল কথা হলো ভারত কোনো ধর্মশালা নয়। যেখানে কারণে অকারণে যারা ভারতের ক্ষতি করেছে তাদের সবাইকে আশ্রয় দিতে হবে।

৪. আজ যখন আদনান সামির মতো ব্যক্তি ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করে অথবা তসলিমা নাসরিন যখন ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করে, তখন দুজনকেই ভারত সরকার তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করে। অথচ এদের দুজনকেই নাগরিকত্ব প্রদানের বিরুদ্ধে বর্তমান ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শোরগোল শুরু করেছিল বা এখনও করে সময় সুযোগ মতো।

সুতরাং বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা মুসলমানদের সিএএ আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য, ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মায়াকান্না শুধুমাত্র কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর

কিছুই নয়। এটি মূলত ভারতকে দুর্বল করার এক ধরনের নির্লজ্জ অভিসন্ধি।

আসল বিষয় হলো ভোটব্যাংক হারানোর ভয় এবং সেই পুরনো বস্তাপচা গল্পের এক অভিনয় চলছে। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আরেকটি আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে। তা হলো সামনের দিনে সারা দেশব্যাপী এনআরসি লাগু করার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন এনআরসি যদি সামনের দিনে লাগু হয় তবে সেক্ষেত্রে সহজেই ভারতীয় নাগরিক ও অবৈধ অভিবাসনকারীদের চিহ্নিত করে বিশ্লিষ্ট করে ফেলার কাজটি অনেক সহজ হয়ে যাবে। ফলে—

● অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চালানো এবং ভোটের সময় লুটপাট করা।

● ভোটব্যাংক হিসেবে কাজ করানোর দোকানটি অনেক রাজনৈতিক দলের বন্ধ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের এই বস্তাপচা গল্পে রাষ্ট্রবাদী ভারতীয়দের বিচলিত না হয়ে ভারতের আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণকারীদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, একবার শিকড় কেটে জেহাদিশক্তি আমাদের বাস্তুচ্যুত করেছিল; আজ একবার নিজের শিকড় নিজে কাটার ব্যবস্থা করে হঠকারী কোনো কিছু করার অর্থ আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। সবরকম ভ্রান্তি দূর করে একজন দায়িত্বশীল ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে এই আইনকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। ■

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES ● SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

ফ ঃ ৪

সিএএ এবং এনআরসি-র মধ্যে পার্থক্য

১. NRC-র মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিবন্ধীকরণ বা ভারতীয় নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি সংযুক্ত। সিএএ আইনের মাধ্যমে ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশ হতে ভারতে আগত শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়।

২. ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ১৯৮৫-র অসম চুক্তির বাস্তবায়নে অসমে এনআরসি হয়েছিল শুধুমাত্র অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে। যে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছিল শুধুমাত্র বংশানুক্রমিকতার নিরিখে। যাদের পূর্বপুরুষরা পাকাপাকিভাবে পূর্ববঙ্গে বসবাস করতেন। সেই সময় এই বিষয়টির সঙ্গে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে দেশত্যাগের বিষয়টি; বিবেচনার মধ্যে ওই আইনের আওতায় আনা হয়নি।

যেখানে সিএএ আইনটি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন একটি আইন হিসেবে রচিত হয়েছে। এটি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক বিষয় নির্ভর করে গঠিত নয়। অর্থাৎ সিএএ তৈরি হয়েছে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ৩১.১২.২০১৪ আগে আসা হিন্দু, শিখ, পার্সি, বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রিস্টান এই ছটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে যে তকমা লাগানো হয়েছিল তা ঘুচিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য এই আইনটি রচিত হয়েছে।

৩. ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী অনুযায়ী এনআরসি-র প্রয়োগ হয়েছে শুধুমাত্র অসমের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। যেখানে সিএএ আইনটি তৈরি হয়েছে— দেশভাগের ফলে ধর্মীয় কারণে যে ছ'টি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় সব থেকে অত্যাচারের শিকার হয়েছিল উপরোক্ত তিনটি দেশে এবং সেই কারণে তাদের ভারতবর্ষে শরণার্থী হতে হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য।

৪. অসমই একমাত্র রাজ্য যেখানে এনআরসি সংগঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশজোড়া এনআরসি-র কোনও আইনসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এখনও নেই। যেখানে সিএএ লাগু করা হয়েছে সারা দেশজুড়ে।

৫. এনআরসি-র ক্ষেত্রে কোনও রকম ধর্মীয় বিষয়ের গুরুত্ব নেই বা বিবেচ্য বিষয় নয়। সিএএ-এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়টি অন্যতম বিবেচনাযোগ্য ফ্যাক্টর বলে চিহ্নিত হবে।

৬. রাষ্ট্রীয় স্তরে এখনো অসম ছাড়া এনআরসি চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু যদি চালু হয় তবে তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, এনআরসি প্রক্রিয়া ভারতীয় নাগরিক ও অবৈধ অভিভাসনকারীদের ফারাক সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করে দেবে।

৭. ২০১৩ সালে অসমে এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। অসমে মূলত প্রতিবাদ সিএএ-এর বিরুদ্ধে, এনআরসি-র বিরুদ্ধে নয়।

তারকেশ্বরে মাতৃশক্তি সমন্বয় সমিতির মাতৃসম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলা মাতৃশক্তি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে গত ১৭ মার্চ তারকেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতির ভবনে মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মধ্যবঙ্গ মাতৃশক্তি সমন্বয় সমিতির সহ সংযোজিকা শ্রীমতী অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, তিন বঙ্গের মাতৃশক্তি টোলির সদস্যা শ্রীমতী শর্মিলা সরকার, তারকেশ্বর জেলা মাতৃশক্তি সমিতির সংযোজিকা শ্রীমতী স্মৃতিকণা পাল, সহ সংযোজিকা শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতা টুম্পা চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক সুনীল বাগ, সহজেলা কার্যবাহ অরূপ চক্রবর্তী, জেলা সদ্ভাবনা প্রমুখ ব্রিজেশ দীক্ষিত এবং গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সহ প্রমুখ দিলীপ পাল।

ভারতমাতা, বাবা তারকনাথ ও স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। মায়েদের সমবেত কণ্ঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এক অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্ট করে। উপস্থিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে তাঁদের হাতে বাবা তারকনাথের প্রতিকৃতি-সহ একটি করে চারাগাছ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। তারকেশ্বর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ২৬৪ জন মা-বোন ৩০ টাকা শুল্ক জমা জমা দিয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর'— কবি নজরুলের 'নারী' কবিতার এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিচালনা শুরু করেন টুম্পা চক্রবর্তী। 'রাষ্ট্র গঠনে নারীর ভূমিকা' বিষয়ে আলোকপাত করেন শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। 'যদি না জাগে ভারত ললনা' স্বামীজীর এই উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করেন। তিনি বৈদিককাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আজকের ভারতবর্ষে নারীর ভূমিকার কথা ইতিহাসের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরেন, যা উপস্থিত সকলের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। নারী সমাজের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন শর্মিলা সরকার। নারী সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীমতী অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ এবং অসুরদলনে মাতৃশক্তির ভূমিকার কথায় মা দুর্গার উদাহরণ তুলে ধরেন। বলেন, লাভ জিহাদের মোকাবিলায় বোনেদের কীভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রতিটি ভাষণের মাঝে মাঝে সুভাষিত, অমৃতবচন ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। সঙ্ঘের জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ নিশীথরঞ্জন বেরা ও জেলা সেবা প্রমুখ প্রবীর ধাড়ার তত্ত্বাবধানে তারকেশ্বর খণ্ড ও নগরের স্বয়ংসেবকরা সম্মেলনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রান্ত বৈঠক

গত ১৭ মার্চ শিলিগুড়ি মাধব ভবনে সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ অধীর নীলকণ্ঠ রায়, উত্তরবঙ্গ

প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী, প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক, সহ সভাপতি মণিকা সরকার, সহ সম্পাদক বিপ্লব দে ও সৌমিত্র কুণ্ডু, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার, নৃত্য বিধা প্রমুখ সঞ্চারী সরকার, লোককলা প্রমুখ অপর্ণা বর্মা, মাতৃশক্তি প্রমুখ শুক্লা অধিকারী ও অঞ্জলি চৌধুরী, প্রাচীন কলা প্রমুখ ক্ষেত্রমোহন দেবসিংহ। এছাড়াও ছিলেন লক্ষ্মণ পাণ্ডে, রঞ্জিত চাকলাদার এবং জেলার স্তরের অন্যান্য পদাধিকারীগণ।

বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী। কর্ম ও বিচারধারা সম্পর্কে বলেন অধীর নীলকণ্ঠ রায়। প্রান্ত থেকে বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র পর্যন্ত কাজের যোজনা করেন বিকাশ ভৌমিক।

অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের আলোচনা সভা

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, মুর্শিদাবাদ শাখার উদ্যোগে এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ (কলকাতা) ভারত সরকারের প্রযোজনায় এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় বহরমপুর শহরের বহরমপুর জলসাঘরে। আলোচনার বিষয় ছিল 'বঙ্গজীবন ও সংস্কৃতিতে রামায়ণ এবং শ্রীরামের প্রভাব'। প্রদীপ প্রজ্বলন করে আলোচনা সভার শুভারম্ভ করেন মুর্শিদাবাদ বিভাগ সঙ্ঘচালক অনিল কুমার ঘোষ। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার সাহা, কাটোয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেন-এর অধ্যাপক ড. সুদীপ্তা তরফদার, রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (উচ্চ শিক্ষা) মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক ড. বিপুল কুমার সরকার এবং বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যাপক ড. দেবরাজ চক্রবর্তী। বক্তারা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর মূল্যবান ও তথ্যমূলক বিস্তৃত আলোচনা করেন। বন্দেমাতরম গানের পরে সভার সমাপ্তি হয়।

মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি খণ্ডের মুরারীপুর শাখায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বীর প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস পালিত হলো। দুপুরে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ কালিদাস মহন্তের পরিচালনায় ৪৪ জন গ্রামবাসীর চিকিৎসা করা হয়।

বিকেলে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্তি বর্মন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতার পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার, উত্তরবঙ্গ আরোগ্য ভারতীর সভাপতি অমিয় মাহাত এবং জেলা কার্যবাহ শুভঙ্কর নাথ।

উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে শাখা চলাকালীন বামপন্থী গুন্ডাদের আক্রমণে প্রশান্ত মণ্ডল বীরগতিপ্রাপ্ত হন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট- হিলি রাস্তার ধারে মুরারীপুর গ্রাম। ওই গ্রামের এক কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলেন প্রশান্ত মণ্ডল। বাল্যকাল থেকেই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকেই গলায় তুলসীমালা ধারণ করতেন। বাড়িতে সবসময় ধুতি পরতেন। স্কুল-কলেজে সহপাঠী ও শিক্ষকদের শত টিপ্পনীতেও তিনি তুলসীমালা ত্যাগ করেননি।

এই কারণে গ্রামে ও স্কুলে তাকে সকলেই 'ঠাকুরদা' বলে সম্বোধন করত। তার সরলতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে সেই সময় দলে দলে কিশোর-যুবকরা সঙ্ঘের শাখায় আসতে শুরু করে। সেই কারণেই বামপন্থী নেতৃত্বের সমস্ত রাগ তার উপরেই এসে পড়ে। তারা স্থানীয় সমাজ বিরোধী ও গুন্ডাদের লেলিয়ে দেয়।

তাদের আক্রমণে সঙ্ঘস্থানেই তিনি বীরগরিপ্রাপ্ত হন।

গোবরডাঙ্গায় চিরন্তন জাতীয় নাট্য উৎসব-২০২৪

গত ১৫,১৬,১৭ মার্চ মহাসমারোহে পালিত হলো অষ্টম চিরন্তন নাট্য উৎসব-২০২৪। প্রথমদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির আদি প্রথা মেনে গর্বিতা দাসের দীপ প্রজ্বলন মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাট্য উৎসবের শুভ সূচনা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর, নাট্যকার ও অভিনেতা ড. অপূর্ব দে, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা ও স্বপন কুমার দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পর্বে ছিল জয়ন্ত বিশ্বাসের পরিচালনায় চিরন্তনের শিশুশিল্পী অদ্রীশ দাসের গৌড়ীয় নৃত্য। চিরন্তন নাট্যোৎসবের প্রথম দিনের প্রথম নাটক ‘বিষয়ের বিষ’ ব্যারাকপুর নিহারিকা প্রযোজিত অসীম কর্মকারের নির্দেশনায় আলকাপ ঘরানার নাটক দর্শকমনে বেশ আনন্দ দিতে পেরেছে। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল জম্মু-কাশ্মীর থেকে আগত লাকি গুপ্তার হাজার রজনী অতিক্রান্ত ‘মা মুঝে টেগোর বনা দে’ মিশ্রিত ভাষায় হলেও দর্শকদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

দ্বিতীয় দিনের নাটক ছিল গোবরডাঙ্গা চিরন্তনের নিজস্ব প্রযোজনা তথ্যনির্ভর ‘রামায়ণ চর্চা’। নাটকটির রচনাকার দলের সম্পাদিকা সুতপা কর্মকার। সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অজয় দাস। এই নাটকে রামায়ণের কোনো গতানুগতিক বিষয় দেখানো হয়নি। কোনো ব্যক্তি নিজে বা সমাজের প্রয়োজনে কী কী শিক্ষা নিতে পারে সেই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই নাটকে কলাকুশলীরা হলেন আশিস বিশ্বাস, গর্বিতা দাস, সুতপা কর্মকার, লক্ষ্মণ বিশ্বাস, দিশা সরদার, রিয়া বিশ্বাস, অনুষ্কা বিশ্বাস, প্রলয় সরদার, সায়ণ দাস, রাজ মণ্ডল ও অদ্রীশ দাস।

তৃতীয় দিনের বঙ্গের আদি ও অকৃত্রিম গৌড়ীয় রীতি কলাশ্রম-এর জয়ন্ত বিশ্বাসের গৌড়ীয় নৃত্য। এদিনের শেষ অনুষ্ঠান মারগন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা প্রযোজনা ‘আত্মারাম’। এদিনের প্রথম পর্বে ছিল আলোচনা সভা। বিষয়, ‘দ্য রোল অব থিয়েটার ফর ফিউচার জেনারেশন’। বক্তা হিসেবে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যায় এবং সংস্কার ভারতীর এক্সিকিউটিভ মেম্বার তথা কলকাতা আকাশবাণী মৈত্রীর নিউজ প্রেজেন্টার প্রবীর ভট্টাচার্য। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা পরিচালক অজয় দাস।

গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিয়ো থিয়েটারে তিনদিনের জাতীয় নাট্য উৎসবের শেষ মঞ্চায়ন ছিল গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘পদ্মানদীর মাঝি’। নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন আশিস চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানে কারিগরি সহায়তা করেছেন দলের সদস্যা গর্বিতা দাস। অনুষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা করেছে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক।

ধর্ম জিজ্ঞাসা—সতেরো

হিন্দু ধর্মের অনন্য প্রকাশ অবতার

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অবতারতত্ত্ব হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্মেও অবতারের কথা আছে, কিন্তু তাঁদের ধারণার সঙ্গে হিন্দুর ধারণার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুর অবতারতত্ত্বের অবতারণায় প্রথমেই একটি কথা বলতে হয়। সেটি হলো পরমত সহিষ্ণুতা। সে কারণেই হিন্দুধর্মে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, অন্য কথায় আস্তিক ও নাস্তিকের অস্তিত্বের কথা মেনে নিয়েও তাদের মধ্যে কোনো বিভাজনের রেখা টানেনি। অন্য কথায়, আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্মের সার কথা ধ্বনিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' বাণীর মধ্যেই। বলা হয়েছে, যে পথই অনুসরণ করা হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর গন্তব্য শেষ হয়েছে তাঁতেই— যাকে বলা হয় ব্রহ্ম। ঈশ্বর অথবা বাস্তবতা— দুয়ের ক্ষেত্রেই সেটাই সব শেষের কথা।

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, এই বিশ্বের জনসংখ্যা যত, ঈশ্বর সাধনার পথও তত। প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও রুচি অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারেন। বলা হয়, এই মরলোকে সব মানুষের গঠন ও প্রকৃতি একরকম নয়। তাই প্রত্যেকেরই নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকার বা স্বাধীনতা রয়েছে। এই বিশ্বাসেই একজন হিন্দুর অন্য ধর্মের অবতার বা তাঁর বৈধতাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। বৌদ্ধমতের প্রবর্তক তথাগত বুদ্ধও তাই হিন্দুর দশাবতারের একজন। তবে নিজেদের ধারণার কারণেই কেবল যিশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে মানতে অথবা হজরত মহম্মদকেই শেষ নবী এবং কোরানকে আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত অভ্রান্ত বাণী হিসেবে মানার ক্ষেত্রে দ্বিধা রয়েছে।

এই দ্বিধা স্বাভাবিক। কারণ হিন্দু ধর্মের অনুগামীরা বিশ্বাস করেন, অবতার অসংখ্য। অতীতে তাঁরা যেমন আবির্ভূত হয়েছেন বর্তমান বা ভবিষ্যতেও সেভাবেই তাঁদের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁরা আসেন অধর্মের বিনাশ করে সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠার জন্য।

হিন্দুধর্ম চূড়ান্ত সত্যের কথা বলে। তার পথ দেখায়। কিন্তু সেটাকেই সত্যের চরম ভাষ্য এমন কথা বলে না। আর ঠিক ওই কারণেই হিন্দুদের কাছে কোনো ঈশ্বরপুত্র অথবা শেষ নবী নেই। নেই সেই চূড়ান্ত শেষ বিচারের কথাও। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সভ্যতার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যই ওইরকম। এই সভ্যতায় কাউকে নায়ক হিসেবে তুলে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-নায়ককেও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রসঙ্গেই আরও একটি কথা বলতে হয়। হিন্দুরা মৃতদেহ কবর বা গেড়ে দেয় না। হিন্দুধর্মে মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার করাই রীতি। হিন্দুর বিশ্বাস, পঞ্চভূতে গড়া এই শরীরই জীবনের ভার বহন করে। মৃত্যুতে যে শরীর আবার সেই পঞ্চভূতেই বিলীন হবে। হিন্দুর এই বিশ্বাসের পেছনে কর্মফল বা জন্মান্তরতত্ত্বের স্বীকৃতি থাকলেও পুনর্জাগরণের কোনো তত্ত্ব নেই। হিন্দুর বিশ্বাস, আত্মা অবিনশ্বর। ছেঁড়া বা পুরনো জামা ফেলে নতুন কিছু পরার মতোই আত্মা কেবল শরীর বদল করে। তাই পরিত্যক্ত সে শরীর সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করে না হিন্দুরা।

ভারততত্ত্ববিদ জার্মান দার্শনিক ম্যাক্সমূলার মন্তব্য করেছেন, এই বিশ্বে যত দার্শনিক মতবাদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মহীয়ান ও শান্তিপ্রদ ধর্মমত হলো বেদান্ত। (ইন্ডিয়া হোয়াট ইট ক্যান টিচ আস।

এসব শোনার পরও কিন্তু প্রশ্নের শেষ নেই। জিজ্ঞাসা— হিন্দুরা তো অবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাহলে তা কেন একটা সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দেয় না? কেনই-বা পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি দেখা দিলে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবানকে নরদেহে অবতীর্ণ হতে হয়?

এমন প্রশ্ন তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অনেকের আরও প্রশ্ন, শ্রুতিতে তো অবতারের কোনো উল্লেখ নেই। এটা তো পরবর্তীকালের পুরাণগুলিতে জনমনোরঞ্জনের জন্য সংযোজিত হয়েছে। তাহলে?

এই অভিযোগ কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। বেদ ও উপনিষদে যে সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, তাতো অবতারতত্ত্বেরই ইঙ্গিত দেয়। শতপথ ও তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও আছে, ব্রহ্মাই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীকে অধর্মর প্লাবন থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব দার্শনিকদের সংযোজন, এই তিনটিই হলো বিষ্ণুর অবতার এবং ওই তিনকে নিয়ে পূর্ণ হয়েছে দশাবতার দর্শন বা তত্ত্ব।

আরও আছে, শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত একটি উপনিষদ— 'মুক্তিউপনিষদ'। তাতে হনুমানকে বেদান্ততত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন ত্রেতা যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্র। পরবর্তীকালে 'শ্রীরাম পূর্বতাপনীয় উপনিষদ, শ্রীরামোত্তরতাপনীয় উপনিষদ, রামরহস্য' উপনিষদগুলিতেও তো সগুণ ব্রহ্মের অবতার হিসেবে পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে অভেদ জ্ঞান লাভের কথা শুনিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র। তাহলে?

একই ভাবে সামবেদের অন্তর্গত 'বাসুদেবোপনিষদ'-এও রয়েছে অবতার সত্তম 'সর্বেশ্বর' বাসুদেবের মন্ত্রাদি বিষয়ে নারদকে সম্যক ধারণা দান এবং ব্রহ্মের অবতার হিসেবে বাসুদেব পূজার সার্থকতার কথা।

এইসব উপনিষদেই অবতারের উপাসনা এবং ব্রহ্ম-উপলব্ধির মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই বরং রয়েছে এক ধরনের সামঞ্জস্য সে কথা প্রাঞ্জলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা যাবে অবতারতত্ত্ব কোনো সময়ই অদ্বৈততত্ত্বের পরিপন্থী নয়। যে যুক্তিতে সাকার ব্রহ্ম বা মূর্তিপূজাকে অদ্বৈততত্ত্বের সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা হয়, একই যুক্তিতে অবতার উপাসনাও ব্রহ্ম উপলব্ধিরই সহায়ক।

মুক্তিকোপনিষদের স্পষ্ট ঘোষণা, তিলে তেলের' মতোই সর্বজীব ও সর্বভূতে ব্রহ্ম বিরাজমান। বাসুদেবও সেই রকমই বিষ্ণুরূপে সর্বত্র রয়েছেন। এটাকেই ধ্যানের বস্তু করে ধ্যানমগ্ন হতে পারলে পরিণামে সাধক জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করতে পারেন। সেই সঙ্গে ঘটে সাধকের মোক্ষলাভ।

পুরাণে বিশদভাবে থাকলেও অবতারতত্ত্বের বীজ কিন্তু বেদ-উপনিষদেও রয়ে গিয়েছে। ঋগ্বেদে যেমন আছে, ইন্দ্র ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারতেন। এটা তো ব্রহ্মের অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ারই বীজ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

অবতারতত্ত্ব হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবতার একটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ অবতরণ। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সবকিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টি যাতে সুস্থিত থাকতে পারে তারই জন্য স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন ধর্মের। এই ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমেই সৃষ্টি তার ধারাকে বহমান রাখতে পারে। তার সুন্দরতম রূপটির প্রকাশ ঘটাতে পারে। অসাধারণ গুণের আধার ধর্ম। যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন অর্থাৎ ধর্মের পথে অগ্রসর হন, ধর্ম তাঁকে রক্ষা করেন তাই বলা হয়— ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

তবুও মাঝে মাঝে মানুষ ধর্মের পথ থেকে সরে আসে। অবজ্ঞার ভাব বা অবহেলা দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। আর তখনই নেমে আসেন তিনি। অমরলোক থেকে মরলোকে অবতীর্ণ হন তখন তিনি পার্থিব দেহ ধারণ করেন। একেই বলে অবতার। আর অবতার সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তাভাবনারই হলো অবতারতত্ত্ব।

অবতারতত্ত্ব কেবল হিন্দু ধর্মের নয়, সব ধর্মের মধ্যেই তার প্রকাশ দেখা যায়। ইংরেজিতে 'ইনকারনেশন' শব্দটি ব্যবহার করা হয় অবতারের প্রতিশব্দ হিসেবে। তবে ইংরেজি 'ইনকারনেশন' আর সংস্কৃতের 'অবতার' শব্দ দুটির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা মনে করেন, 'ইনকারনেশন' হলো পার্থিব শরীরধারীর অবতরণ। এটা একটা অসম্পূর্ণ অনঙ্গ বিষয় অর্থাৎ 'ইনকারনেশন' হলো ঐতিহাসিক ব্যাপার। অন্যদিকে অবতার হচ্ছেন পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণের প্রকাশ। অবতারতত্ত্ব যেমন হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, তেমনই 'ইনকারনেশন' তত্ত্বর সন্ধান পাওয়া যায়, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের মধ্যে।

ধর্মবেত্তারা মনে করেন, হিন্দু ঐতিহ্যে অবতার হলো এক দৈবী অবতরণ। অসীম অনন্ত থেকে এই পার্থিব সীমার মধ্যে প্রকাশ ঘটে অবতারের মধ্যে। অবতার হলেন নির্গুণ ব্রহ্ম বা আত্মার সগুণ প্রকাশ। হিন্দু ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে, অবতাররা আসেন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেটা সিদ্ধ হওয়ার পর তাঁরা ফিরে যান আপন আলয়ে। তাই অবতার এক নন, বহু।

অন্যদিকে যেসব দেশে অবতীর্ণ ধর্মীয় মহাপুরুষকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বা দূত বলে মনে করা হয়, সেখানে সেই অনন্য প্রবর্তকের বাণীকেই ধর্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়। তাঁদের কাছে এই তত্ত্ব অস্বীকারকারীরা হলেন অবিশ্বাসী। এই অবিশ্বাস দণ্ডনীয় অপরাধ। তাঁদের নিপীড়ন করাটাকেও তাঁরা ধর্মেরই অঙ্গ বলে বিশ্বাস করেন। ওইসব সর্বাত্মক ধর্মে প্রশ্ন মীমাংসার কোনো অবকাশ নেই।

হিন্দুধর্মে, অবতার একজন নন, বহু। ধর্ম কোনো কারণে কলুষিত হলেই অবতারপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। কাল বা যুগের সমস্যা নিরসনে তাঁদের আবির্ভাব। যেমন সমস্যা, তার সমাধানে তেমনই ব্যবস্থা। তাই একই বাণী শোনা যায় না তাঁদের কণ্ঠে। এবং সেখানেই হিন্দুধর্মের উদারতা।

হিন্দু ধর্মের চরম লক্ষ্য, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। এই মানুষ কোনো বিশেষ স্থান বা ধর্মের সীমায় বদ্ধ নয়, এ মানুষ বিশ্বমানব— সর্বজনীন মানুষ। তাই হিন্দুর প্রার্থনা— সকলে শান্তিতে— নীরোগ দেহে সুখে থাকুক। সে কারণেই যে মানুষের মধ্যে দেবত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, স্থান-কাল-জাতি নির্বিশেষে তিনিই হিন্দুর নমস্য। এবং কোনো এক অবতার বা ভগবৎ প্রতিনিধি- নির্দিষ্ট পথ না নিয়ে অন্য অবতারকে অনুসরণ করলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় একথা হিন্দুরা বিশ্বাস

করে না।

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, সব দেব-দেবীই ধর্ম সংস্থাপন বা মানব কল্যাণে অবতার হিসেবে এই মাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সাধারণভাবে বিষ্ণুর অবতার সম্পর্কে সকলে বেশি অবহিত। অবতার বললেই হিন্দুধর্মে যে দশজনের কথা বলা হয়, তাঁরা সকলেই বিষ্ণুর অবতার। এই দশাবতার নিয়েই পুরাণ এবং অন্যত্র সবচেয়ে বেশি কথা ও কাহিনির সন্ধান পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর এই দশটিই পূর্ণাবতার। এই দশাবতারের তালিকায় আছেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণবলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এই দশের মধ্যে কল্কি এখনও অনাগত। তাঁর আবির্ভাব ঘটবে কলিযুগের শেষ লগ্নে।

মৎস্য পুরাণের কাহিনি, ভৃগুর অভিশাপে বিষ্ণুকে সাতবার ‘মানব জন্ম নিতে হয়। এটা কর্মতত্ত্বেরও উদাহরণ। ভৃগুর অভিশাপে অভিশপ্ত বিষ্ণুর সাত অবতার হলেন— দত্তাত্রেয়, মান্ধাতা, পরশুরাম, রাম, ব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি। এই সাতজনের সঙ্গে নারায়ণ, নরসিংহ ও বামন মিলে সম্পূর্ণ হয় দশাবতারের তালিকা।

পদ্মপুরাণে বিষ্ণুর মানবজন্ম সম্পর্কে একাধিক কাহিনি রয়েছে। একটি কাহিনি, অসুরগুরু শুক্রাচার্য তপস্যা করতে গেলে ভীত অসুররা তাদের মা পুলোমার কাছে আশ্রয় নেয়। ইন্দ্রর নেতৃত্বে দেবতারা সে সময় অসুরদের আক্রমণ করতে এলে, পুলোমা কটমট করে তাকিয়ে ঘোর নিদ্রা সৃষ্টি করে ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করেন। পরে ইন্দ্রের প্ররোচনায় পুলোমার মাথা কেটে ফেলেন বিষ্ণু। রেগে শুক্রাচার্য অভিশাপ দেন নারী হত্যার জন্য বিষ্ণুকে সাতবার মানবজন্ম নিতে হবে।

অন্য কাহিনি, ভৃগু-কন্যা লক্ষ্মী একটি পুরী তৈরি করে সেটি বাবার কাছে রাখতে দেন। লক্ষ্মী পরে সেটি ফেরত নেওয়ার জন্য বিষ্ণুকে পাঠান। কিন্তু ভৃগু সেটি দিতে চান না। তাই বিষ্ণু বারবার তাগাদা করেন। বিরক্ত ভৃগু রেগে অভিশাপ দেন, বিষ্ণুকে দশবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে।

পদ্ম পুরাণেরই আরেক কাহিনি, বিষ্ণু যজ্ঞ-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভৃগুকে। কিন্তু ইন্দ্রের কথায় দেবতারা যজ্ঞস্থান ছেড়ে যুদ্ধ করতে গেলে দানবরা এসে যজ্ঞ নষ্ট করে দেয়। ক্রুদ্ধ ভৃগু শাপ দেন, দশ জন্ম বিষ্ণুকে মানব রূপে জন্ম নিতে হবে।

বিষ্ণু দেবমাতা অদিতির গর্ভে জন্ম নিতে চাইলে অদিতিকেও দশবার মানব জন্ম নিতে হয়। এতো গেল পৌরাণিক কাহিনি। বৈষ্ণবীয় দর্শনে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের মুখ্য দশটি অবতারকে একসঙ্গে দশাবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দশাবতারের কথা রয়েছে গরুড় পুরাণে।

বিষ্ণুর এই দশ অবতারের মধ্যে— প্রথম চারটি অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহের আবির্ভাব হয় সত্য যুগে, পরের তিনটি বামন, পরশুরাম ও রাম অবতার হন ত্রেতাযুগে। দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর একটিই অবতার কৃষ্ণ। বেশিরভাগ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলরামকেও বিষ্ণুর অবতার হিসেবেই গণ্য করেন। যেসব সূত্রে বুদ্ধের উল্লেখ নেই সেখানে বলরামকেই নবম অবতারের মর্যাদা দেওয়া হয়। কলি যুগে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে আর দশম অবতার কল্কি অবতীর্ণ হবেন কলির একবারে শেষ দিকে।

গরুড় পুরাণে বিষ্ণুর দশটি অবতারের কথা বলা হলেও, ভাগবত পুরাণে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ২২। তারপরেও ভাগবতের অন্যত্র বলা হয়েছে, বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা অসংখ্য।

পদ্ম পুরাণে বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা ২০। বরাহ ও অগ্নি পুরাণে সংখ্যাটা ১০, পঞ্চরাত্র, সাত্বত ও অহিবুর্ধ্ন্য সংহিতায় অবতারের সংখ্যা ৩৯। দেবী পুরাণে আবার সংখ্যাটা ৬০। কিছু মতে, বিষ্ণুর ৩৯ জন অবতারের তালিকাটিই সবচেয়ে প্রাচীন।

গরুড় পুরাণে বিষ্ণুর যে দশ অবতারের উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা সকলেই পূর্ণাবতার। কৃষ্ণকে তো বলা হয়েছে ‘স্বয়ং ভগবান’।

অবশ্য বৈষ্ণবীয় দ্বৈততত্ত্বের প্রবক্তা মধ্বাচার্য মনে করেন, অবতারের কোনো বিভাগ হয় না। সকলেই এক। কিন্তু বেশিরভাগ বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক সেকথা মানেন না। তাঁরা অবতারের বিভাগীয়করণেই বিশ্বাসী।

হিন্দুধর্মের এই অবতারতত্ত্বের আরেক বৈশিষ্ট্য অবতাররা সকলেই একরকম নন। তাঁদের পূর্ণ ও আংশিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বিষ্ণু যখন প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হন এবং ঈশ্বরের সব শক্তি ও গুণের প্রকাশ ঘটে তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার। যেমন— নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ। আর বিষ্ণু প্রত্যক্ষ কিন্তু আংশিক ভাবে অবতীর্ণ হলে তাঁকে বলা হয় অংশাবতার। যেনন— মৎস্য, পরশুরাম।

এছাড়া অবতারদের পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, মানবান্তর অবতার, যুগাবতার ও শাক্তাবেশাবতার— এই ছ'টি শ্রেণীতেও বিন্যাস করা হয়।

সাত্বত তন্ত্র অনুযায়ী পুরুষ অবতার মহাবিষ্ণু, গর্ভোদাকাশায়ী ক্ষীরোদাকাশায়ী এই তিন ধরনের। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র হলেন গুণাবতার। ব্রহ্মার দত্তাত্রেয়, হয়শির, হংস হলেন লীলাবতার। যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেনা, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিতা, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষকসেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্‌ভানুরা মানবান্তর অবতার। যুগাবতারদের মধ্যে আছেন চার যুগে অবতীর্ণরা এবং নারদ, সনক ইত্যাদি হলেন শাক্তাবেশাবতার।

আরও বিশদে বলা হয়— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর— এই ত্রয়ী গুণাবতার রূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি স্থূল দেহধারীরা হলেন লীলাবতার এবং শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ আবেশাবতার। এসবই বৈষ্ণব দর্শনের কথা।

হিন্দু পুরাণে বিষ্ণু ছাড়া দেবীশক্তির অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হন ত্রিপুরাসুন্দরী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি। এছাড়া গণেশ, শিব প্রমুখ অন্য কয়েকজনের অবতারের কথাও আছে। সব মিলিয়ে অবতাররা হলেন হিন্দুধর্মের এক অনন্য প্রকাশ। □

সন্দীপ ঘোষাল

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

এই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর আর প্রণব একই বস্তু। হরে, কৃষ্ণ, রাম— এই তিনটি অংশই প্রণবের তিনটি অবয়ব— অ, উ, ম। রাম মানে রতি বা প্রেম। কৃষ্ণ মানে একাগ্রতা। অতএব এর অর্থ, সর্বদা স্থির হয়ে প্রেমের সঙ্গে হরিনাম কর। ব্রহ্ম হতে কর্ম উদ্ভূত হয়। কর্ম আবার ব্রহ্মে গিয়ে লীন হয়। ব্রহ্ম উদ্ভূত হয় অক্ষর হতে। অক্ষর মানে অব্যক্ত, ব্রহ্ম তারই প্রাকট্য। স্থির বায়ুতে স্তর নেই, চঞ্চল বায়ুতে স্তর আছে। মন, বুদ্ধি ও প্রাণ এই তিনটি এক হলেই প্রণব হয়। মনস্থির হলেই বুদ্ধি জাগে বা চৈত্যন্যের উদয় হয়। তখন প্রাণের সঞ্চার হয়।

প্রাপ্তির ক্রম হলো— প্রথমে সূর্যমণ্ডল। এটাই দেবমণ্ডল। কারণ সূর্যেই সব দেবতার বাস। তারপর চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডলের পর অগ্নিমণ্ডল। তার ঊর্ধ্বে সুদর্শন। এটাই সত্য বা সত্ত্ব। সকলের ঊর্ধ্বে অমৃত বা আনন্দ। মহাভারতে বিমাতা কদ্রুর আদেশে স্বমাতা বিনতার দাসীত্ব মোচনের জন্য গরুড় অমৃত এনেছিল তা বাস্তবিক পক্ষে এই ক্রমে। গরুড়ের পূর্বজ অরুণ। মহাভারতে যে গজ-কচ্ছপের কথা আছে তা শ্বাস-প্রশ্বাস।

সব জিনিসই গাঢ় বা গভীর হলে নীল হয়। জল গাঢ় হলে নীল হয়। গাঢ় অগ্নি নীল। মধ্যাহ্নে সূর্যও তাই। গভীর আকাশও নীল। প্রদীপ নির্বাণোন্মুক্ত হলে একটি নীলজ্যোতি দেখা যায়। সেটা গভীর জ্যোতি। ওটার চারিদিকে একটি সুবর্ণ জ্যোতির বেষ্টন থাকে। ওই সুবর্ণ জ্যোতিটিকে গৌর বলে। ওর ভিতরে কৃষ্ণ। মস্তিষ্ক হতে যে ব্রহ্মদণ্ডটি নেমেছে সেটাই কল্পবৃক্ষ। এটিকে আশ্রয় করে যা কিছু কামনা করা যায় সব সফল হয়। একে অবলম্বন না করে কারওই চলবার উপায় নেই। মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এই স্থানেই আশ্রিত। এই ব্রহ্মনাড়ীতে সকল জগতের প্রতিষ্ঠা। ভিতরে যা, বাইরেও তাই।

শূন্য বা নীলাকাশের চিন্তা করতে করতে নীলাকাশের বিকাশ হয়। সামনে যে আকাশ আর চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদি, এখানেই আসে চিন্তা। চিন্তা করতে করতে নীলাকাশের কাছে এসব, তখন তাতে রং থাকবে না। নিজের দেহের মধ্যখানটিতে যে নাড়ী আছে তাতে ওই শূন্য বা নীল ভরা রয়েছে। প্রথমে একটি রেখার মতো প্রকাশ পাবে, পরে আর রেখা থাকবে না। সবই আকাশ বা শূন্য হয়ে যায়। ওই নীলাকাশ মূর্তিমান হয়ে বিরাজ করছে, নক্ষত্রাদি সকলে তার সেবা করছে, নিরন্তর নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটি লীলার অবস্থা। অহং আছে, কর্তৃত্ববোধ নেই, অভিমান নেই। সর্বত্র অনুগত ভাব। সকলেই কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ। কারও অন্য কোনো চিন্তা নেই। একমাত্র কৃষ্ণের অনুশীলনই লক্ষ্য। পরে তাও থাকে না। নিভৃত-নিকুঞ্জ সেবায় আমি-তুমি থাকে না। মঞ্জরী ভাব মানে তন্ময়তা। নিকুঞ্জে পঞ্চবাণের বিকাশ হয়— তাতে রসের আস্বাদন হয়। (পঞ্চবাণ বলতে পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি পাঁচটি বিষয় বুঝতে হবে)। ব্রহ্মনাড়ির ঠিক মধ্যস্থলকে নিকুঞ্জ বলে।

লীলাচক্রে থাকা অবস্থায় যে-যে কল্পনা বা ইচ্ছা জাগে সেরকমই দর্শন হয়। পরে বা আগে তা হয় হয় না। লীলাভেদেও তা হয় না— লীলার আগেও তা হয় না। লীলাচক্রটি যোগমায়া চক্র। এতে ইচ্ছা কল্পনা প্রভৃতির উদয় হয়। এটাই পৌর্ণমাসী। রাধা সর্বদাই অনাবৃত চন্দ্রতাপে কৃষ্ণকে দেখতে পায়। চন্দ্রপ্রভা। ব্যাধি বা রোগ বাধা-ই, অর্থাৎ আবরণ। যেখানে বাধা নেই তাই স্বাস্থ্য, প্রকৃতি বা স্বভাব। বিকারই দুঃখ, স্বভাবই আনন্দ।

এই দেহের মতো বহু দেহ নির্মাণ করে নানাস্থানে বিচরণ করা যায়। তা সূক্ষ্ম দেহ নয়। এই স্থূল দেহকে চতুর্দেহ বলে। কারণ তা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এটাই বিভূতি। এক প্রদীপ হতে যেমন বহু প্রদীপ জ্বালানো যায় ঠিক সেরকম এক দেহ হতে বহু দেহের আবির্ভাব হতে পারে। মনদ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা দেহের অংশ বের করতে হয়। এই সব অংশগুলি দেখতে ঠিক মূলের অনুরূপ। □

সামাজিক সমরসতা সঙ্ঘের রণনীতি নয়, নিষ্ঠার বিষয় : দত্তাত্রেয় হোসবালে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা গত ১৫ থেকে ১৭ মার্চ নাগপুরের রেশমিবাগে সম্পন্ন হলো। সভায় দত্তাত্রেয় হোসবালে সরকার্যবাহ হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ২০২১ সাল থেকে এই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত ৯৯ বছর ধরে সমাজ সংগঠনের কাজ করে চলেছে। আগামী ২০২৫ সালের বিজয়াদশমীতে সঙ্ঘ একশো বছর পূর্ণ করবে। তিন দিনের বৈঠকে সঙ্ঘকাজের বিশেষ করে শাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শতাব্দী বর্ষকে উপলক্ষ্য করে কার্যবিস্তারের দৃষ্টিতে ১ লক্ষ শাখা বিস্তারের লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পূর্বতন সহ-সরকার্যবাহ ড. মনমোহন বৈদ্য জানান, এখন সারা দেশে ৭৩,১১৭টি নিত্য শাখা চলছে। গত বছরের তুলনায় ৪৪৬৬ শাখা বেড়েছে। এই শাখাগুলিতে ৬০ শতাংশ বিদ্যার্থী এবং ৪০ শতাংশ চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা আসেন। সাপ্তাহিক মিলন চলছে ২৭,৭১৭টি। গত বছরের তুলনায় ৮৪০টি বৃদ্ধি হয়েছে। সঙ্ঘমণ্ডলীর সংখ্যা ১০, ৫৬৭। নগর ও মহানগরের ১০ হাজার বসতিতে ৪৩ হাজার শাখা চলেছে। অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে স্বয়ংসেবকরা সমাজের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাপক জনসম্পর্ক করেছেন। অক্ষত বিতরণ অভিযানে ৫,৭৮,৭৭৮ গ্রামে এবং ৪৭২৭ শহরে মোট ১৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭১টি পরিবারে সম্পর্ক করা হয়েছে। এই কাজে ৪৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৩৪ জন স্বয়ংসেবক-সহ রামভক্ত অংশগ্রহণ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পুনর্নির্বাচিত সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে ১৭ মার্চ প্রতিনিধি সভা স্থলে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে বলেন, সামাজিক সমরসতা সঙ্ঘের রণনীতির অংশ নয়, বরং নিষ্ঠার বিষয়। সজ্জন শক্তিসমূহের একত্রীকরণ এবং সামুহিক প্রয়াসের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন হবে। সম্পূর্ণ সমাজকে যুক্ত করে সামাজিক পরিবর্তনের দিশায় অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে সঙ্ঘ কৃতসংকল্প। শ্রী হোসবালে গুরুত্বের সঙ্গে বলেন, রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ঘটনায় সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপক অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়েছে। প্রতিনিধি সভাস্থলে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী পরিসরে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর পুনর্নির্বাচিত সরকার্যবাহকে অভিনন্দন জানান। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে দত্তাত্রেয় হোসবালেজী সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন বছরের (২০২৪-২০২৭) জন্য সরকার্যবাহ রূপে নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রেস কনফারেন্সে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী হোসবালে জানিয়েছেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের মহোৎসব। দেশে গণতন্ত্র ও একতাকে অধিক শক্তিশালী করা এবং দেশের উন্নতির গতি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা একশো শতাংশ মতদানের জন্য সমাজে জনজাগরণ করবেন। সমাজে এই বিষয়ে কোনো মনান্তর, বিচ্ছিন্নতা, মতভেদ বা একতার পরিপন্থী কোনো আলোচনা যাতে না হয়— সেই বিষয়ে সমাজকে জাগ্রত থাকতে হবে।

ফঃ৫

শ্রী হোসবালে আরও বলেন, সঙ্ঘের কাজ হলো দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান জাগ্রত করা। আমরা সকলে এক সমাজ, এক দেশের অধিবাসী। আগামী ২০২৫-এর বিজয়াদশমীর আগে পূর্ণ নগর, পূর্ণ মণ্ডল, পূর্ণ খণ্ডে দৈনিক শাখা ও সাপ্তাহিক মিলনের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। সঙ্ঘের কাজের প্রভাব আজ সমাজে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

সমাজের এই আত্মীয়তার কারণে সমাজের প্রতি সঙ্ঘের ধন্যবাদের ভাব ও কৃতজ্ঞতার ভাব রয়েছে। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, সম্পূর্ণ সমাজ সংগঠিত হোক— এটিই সঙ্ঘের স্বপ্ন। পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক সমরসতা— এগুলি কোনো একটি সংগঠনের অভিযান নয়, বরং পুরো সমাজের অভিযান। দেশে অনেক ছোটো গ্রামে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা দেখা যায়। শহরে এর প্রভাব অত্যন্ত কম। গ্রামে পুকুর, মন্দির ও শ্মশানে সমাজে কোনোরকম ভেদভাব থাকা উচিত নয়।

অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রী হোসবালে বলেন, সন্দেশখালির অপরাধীদের যাতে কঠিনতম শাস্তি হয় সেজন্য নিপীড়িত মহিলাদের মাধ্যমে প্রতিনিধি মণ্ডল ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন জানিয়েছে। সঙ্ঘের সমস্ত কার্যকর্তা ও আনুষঙ্গিক সমস্ত সংগঠন সমস্ত স্তরে সক্রিয় ভাবে সন্দেশখালির মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সংখ্যালঘু সংক্রান্ত বিষয়ে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ জানিয়েছেন, আমরা Minoritarian Politics-এর বিরোধিতা করছি। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সরসঙ্ঘচালক মুসলমান ও খ্রিস্টান নেতাদের সঙ্গে বার্তালাপের মাধ্যমে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন আগে মণিপুরে যে সামাজিক সংঘর্ষ হয়েছে, সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই আঘাত অত্যন্ত গভীর। কুকি ও মৈতেই জনজাতির মধ্যে সঙ্ঘের কাজ থাকার ফলে আমরা দুই জনজাতির নেতৃত্বের সঙ্গে বার্তালাপের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা করেছি। এই প্রচেষ্টায় সফলতাও এসেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নতুন কার্যকারিণীতে সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে ২০২৪-২৭ কার্যকাল পর্যন্ত ছয়জন সহ-সরকার্যবাহ নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা হলেন—

১. ড. কৃষ্ণগোপালজী, ২. মুকুন্দজী, ৩.অরুণ কুমারজী, ৪.রামদত্ত চক্রধরজী, ৫. অতুল লিময়েজী, ৬. আলোক কুমারজী।

প্রতিনিধিসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—

শ্রীরামমন্দির থেকে জাতীয় পুনরুত্থান

৫১২৫ যুগাব্দের পৌষ শুক্লা তিথিতে (২২ জানুয়ারি, ২০২৪) অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে শ্রীরামলালার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ণময় এবং দিব্য ভাবপূর্ণ অনুষ্ঠানটি বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই দিব্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে সাধুসন্তদের নেতৃত্বে দেশব্যাপী হিন্দু সমাজের নিরন্তর আন্দোলন, সংগ্রাম এবং যন্ত্রণার স্থায়ী, শান্তিপূর্ণ ও কাঙ্ক্ষিত সমাধান অর্জন করা সম্ভব হলো। এটা উল্লেখ করতেই হয় যে, আমাদের জীবনে এই শুভমুহূর্ত বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হয়েছে সমগ্র হিন্দু সমাজের আন্দোলন, বহু গবেষক, শিক্ষাবিদ, স্থপতি, আইনবিদ, বীরগতিপ্রাপ্ত রামভক্ত এবং বর্তমান সরকার তথা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অবদানের ফলে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সেইসব বীরগতিপ্রাপ্ত রামভক্তদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে এবং উল্লেখিত অন্যান্য ব্যক্তি যাঁরা এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদন সম্ভব করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

অযোধ্যার মন্দির থেকে প্রেরিত পবিত্র 'অক্ষত' (পূজিত চাল) বিতরণে সারা সমাজ উৎসাহের সঙ্গে শামিল হয়েছে। লক্ষ লক্ষ রামভক্ত এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোটি কোটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ২২ জানুয়ারি শুধু ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ ভব্য, দিব্য কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রাম-শহর-রাজপথ, অলিতে-গলিতে, মহল্লায় সর্বত্র প্রভাতফেরি, গৈরিক পতাকা উত্তোলন, বিশেষ পূজাপাঠ, প্রসাদ বিতরণ হয়েছে। মন্দিরে ও ঘরে ঘরে দীপ প্রজ্বলন করা হয়েছে। সমগ্র সমাজে নবীন উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে।

শ্রীঅযোধ্যাধামে প্রাণপ্রতিষ্ঠার শুভ অনুষ্ঠানে সমাজের ধর্মীয়, কলা, শিক্ষা, উদ্যোগ, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত মত ও পন্থের শ্রদ্ধেয় সাধু-সন্তদের উপস্থিতি সামাজিক বন্ধনের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভু শ্রীরামের মূল্যবোধকে ভিত্তি করে এক সুদৃঢ়, সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই অনুষ্ঠান ভারতের জাতীয় জাগরণের এক গৌরবময় উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে শ্রীরামলালার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বিদেশি শাসনের ফলে উদ্ভূত আত্মবিস্মৃতি ও হতাশা থেকে সমাজ মুক্ত হয়েছে। হিন্দুত্বের চেতনায় উদ্দীপ্ত সমগ্র সমাজ তার 'স্ব'-কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের জীবন আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে এবং সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করে। শ্রীরামচন্দ্রের শাসনব্যবস্থা মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'রামরাজ্য' নামে একটি চিরন্তন ও সর্বজনীন আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের ক্রমাবনতি, মানবিক সংবেদনশীলতার অবক্ষয়, ক্রমবর্ধমান প্রসারণবাদী সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার বাড়বাড়ন্ত রোধ করার জন্য রামরাজ্যের ধারণাটি আজও সমগ্র বিশ্বের কাছে অনুকরণের যোগ্য। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে, এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা সার্থক হবে যখন সমগ্র সমাজে মানুষ নিজের জীবনে শ্রীরামের আদর্শ অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করবে। ধর্মের যেসব শাশ্বত মূল্যবোধ যেমন— ত্যাগ, সহমর্মিতা, শৌর্য, নিরপেক্ষতা, সৌহার্দ্য ও ন্যায়পরায়ণতা— যা শ্রীরামের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার দ্বারা সমাজের পুনর্জাগরণ অপরিহার্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। সমস্ত প্রকার বিবাদ-বৈষম্য সমাপ্ত করে সম্প্রীতিপূর্ণ শক্তিশালী সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমেই হতে পারে প্রভু শ্রীরামের প্রতি প্রকৃত অর্ঘ অর্পণ।

প্রতিনিধি সভা দেশবাসীকে এমন ভারত নির্মাণের আহ্বান জানায় যেখানে ভ্রাতৃত্ব, কর্তব্যপরায়ণতা, মানবিক চেতনা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বিরাজ করবে, যার ভিত্তিতে একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ভারত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে বিশ্ব কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারে। □

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে বিরোধিতা আদতে মানবাধিকারের অসম্মান

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

একদিন তারা ঘর ছাড়ার সময় একে অন্যকে বলেছিল— 'এমন সুযোগ আর আসবে না কোনোদিন। বাছবাছাই না করে হাতের কাছে যা পাস তাই দিয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে নে হুট করে। ... আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে, নতুন জিনিস-মানুষ নয়, জিনিস— সে জিনিসের নাম কী? নতুন জিনিসের নতুন নাম— উদ্বাস্তু।'

বুকের ভিতর লক্ষ ক্ষতে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের কলমে ধরা যায়, খুব কম করে হলেও স্পর্শ করা যায় উদ্বাস্তু, বিশেষ করে ধর্মীয় অত্যাচারে প্রাণ বাঁচাতে উদ্বাস্তু পরিচয় কপালে লিখে জীবন শুরুর পর্ব কতটা ভারাক্রান্ত। কান্নাভরা আতঙ্কিত মুখ থরে থরে এসেছে এ দেশে। ১৯৪৭, ১৯৫০, পূর্ব পাকিস্তান থেকে, আফগানিস্তানের থেকে। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। তারপরেও একই দৃশ্য! অমুসলমানদের জন্য রহমতচাচারা চাচার দায়িত্ব, মনন, চর্চা কিছুই করল না। বুঝিয়ে দিল অমুসলমান হলে তুমি বাপু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ব্যবহার বৈষম্যে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, মানবাধিকার তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়। একজন ভুক্তভোগী তপন রায়চৌধুরী। তাঁর 'রোমন্থন' আত্মজীবনীতে লিখে ফেললেন সেই চরম অপ্রিয় সত্যি, 'আমরা বুঝলাম পূর্বপুরুষের ভিটে এবার ছাড়তে হবে, ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হবে সেখানে মুসলমান ভিন্ন অন্য সব সম্প্রদায়ের নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হবেন।'

আজকেও চূড়ান্ত সত্যি ও প্রাসঙ্গিক পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে। যে তিন-তিনটি ইসামিক দেশ ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক নিপীড়নে হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে। একই নির্যাতনের শিকার অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও— শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, খ্রিস্টান। এই তিন ইসলামিক দেশ যেখান থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সংখ্যালঘুদের বারবার আশ্রয় দিয়েছে ভারত। দিয়েছে সুরক্ষা, মানবাধিকার ও রাষ্ট্রীয় পরিশীলন। বাংলাদেশেই প্রকাশ্যে লেখা হয়েছিল 'একটা-দুইটা হিন্দু ধর/সকাল বিকাল নাস্তা কর।' বাংলাদেশে প্রতিদিন হচ্ছে এথনিক ক্লিনজিং।

১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এক প্রহসন হয় পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে। তা যে হবে সে ইঙ্গিত আগেভাগেই গান্ধীজীই দিয়ে রেখেছিলেন। তাই ১৯৪৭-এর ১৬ জুলাই গান্ধীজী বলেছিলেন, যে সব হিন্দু ভয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসবে, ভারত তাদের সাদরে গ্রহণ করবে। নেহরুও তো বলেছিলেন তাদের আমাদের দেশে 'আশ্রয়' দিতে হবে। আজকে তবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কেন দরকার, কিই-বা তার এত গুরুত্ব, কেনই-বা এত আবেগ। ওই 'আশ্রয়' শব্দটিকে ধুয়ে মুছে চিরতরে বিদায় দেওয়ার জন্যই এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও মানবিক এই আইন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ, ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হলো। সেই অনুসারে ২৫ মার্চ পর্যন্ত যারা ভারতে এসে বসবাস করেছেন তারা ভারত সরকারের নিয়মানুসারে ভারতীয়। কিন্তু তারপরেও লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে এ দেশে আসতে হয়েছে। তারা লড়াই করেছে, স্থিতিস্থাপকতা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতার হাজার পরীক্ষা দিয়েছে। শুনেছে তারা উদ্বাস্তু। ওপারে যখন তুলসীমঞ্চটাকে একলা ফেলে রেখে আসতে বাধ্য হলো, যখন পোঁটলা বাঁধল তখন ক'জন আনতে পেরেছিল সেখানকার নাগরিকের তথ্য প্রমাণ। তারা পশ্চিমবঙ্গে এল, একদা-উদ্বাস্তু স্থানীয় নেতার হুব্বাগিরি দেখল। সরকার জমি দিল। বেড়ার বাড়ি। টিনের বাড়ি। তাপর ইটের বাড়িও করল কত মানুষ। অবশ্যই তারা অনেকেই ভোটার কার্ড তৈরি করল। ভোট প্রদান করল। কত সরকার এল গেল। সরকার বেজায় খুশি— জমির পাট্টা দিয়েছি, দোকান ঘর বসাতে দিয়েছি— ভোটটাও আমার দলকেই দেবে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের মনেই হলো না ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর আসা মানুষগুলোর বাড়ির প্রতিটি ইটে শরণার্থী শব্দটা এখনও আইনত লুকিয়ে আছে। তাদের অধিকারের সঙ্গে প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে সুবিচার করার নাম সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। যা ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের আগে তিন ইসলামিক দেশ থেকে আসা ছয় সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী সব মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদান করবে। এ এক আত্মসম্মানের

শংসাপত্র, আরও একটু মাথা উঁচু করে বাঁচার উন্নতিরেখা।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, যার সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের কোনো সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক নেই অন্যান্য দেশের থেকে আসা এবং ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইন মারফত ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনকারীদেরও। অসুবিধা নেই আমার আপনার। বিন্দুমাত্র অসুবিধার প্রশ্ন ওঠে না ২০১৪-র ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যা সমাধানের পর যে ১৪,৮৬৪ জন বাংলাদেশিকে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে তাদের। যাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান। কোনো নাগরিককে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) দ্বারা বিতাড়িত করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সেই প্রভিশন আছে ১৯৪৬-এর বিদেশি আইন এবং ১৯২০-র পাসপোর্ট আইনে। সিএএ ও এনআরসি আদৌ কেউ কারোর সঙ্গে সংযুক্ত নয়। ওটাও এক বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক আওয়াজ। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের থেকেই ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল এনআরসি। আরও স্মরণ করাতে চাই ২০০৩ সালে এই বিশেষ কিছু নিয়মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব আইনে এনআরসি সংশোধনী সংযুক্ত হয়েছিল। এটা কিছুই নয়, ভারতীয়দের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ও জাতীয় পরিচয়পত্র।

সিএএ তাই ঠিক কোন যুক্তিতে এনআরসি জুজু দেখাচ্ছে বুঝতে চাইলে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই উত্তর আসবে না। এবার প্রশ্ন, তবে কী হবে সিএএ দিয়ে? ১১ মার্চ ২০২৪ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সংক্রান্ত বিধি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই আইন ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত তিন ইসলামিক দেশের (পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ) নিপীড়িত, অত্যাচারিত, পালিয়ে আসা নির্যাতিত অমুসলমান মানুষদের জন্য। যাদের পাসপোর্ট আইন এবং ফরেনার্স আইন থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সিএএ সেই সব প্রাণ হাতে এদেশে পালিয়ে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানদের জন্য যারা তিনটি ইসলামিক দেশে প্রবল বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। মানবাধিকারের থেকে যারা বঞ্চিত তাদের মানবাধিকারের দরজা দেখাল সিএএ। সিএএ-র ২ (১) (বি)-ধারাতে উল্লেখ রয়েছে ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যত শরণার্থী এদেশে ওই তিন ইসলামিক দেশ থেকে এসেছেন তারা সবাই ভারতের আইনসিদ্ধ নাগরিক। সবাই বৈধতার অধিকারী। এদেশে তাদের বসবাসের ন্যূনতম সময়সীমা ১+১১ থেকে কমিয়ে তা করা হলো ১+৫ বছর। কেবলমাত্র এই সিএএ আইনটি সংবিধানে ষষ্ঠ তপশিল বর্ণিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইনার লাইন পারমিটের অধীনে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে প্রযোজ্য হবে না।

এখন দোলাচল থাকতেই পারে, তবে কি আর কোনো মুসলমান নতুন করে ভারতে নাগরিকত্ব পাবেন না? কেন না! তারা পূর্ববর্তী নিয়মানুসারে ১১ বছর বসবাসের পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতেই পারেন। এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে উচ্ছ্বাস থাকবে মূলত তিন ইসলামিক দেশ থেকে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ভাবে নিপীড়িত লাঞ্ছিত অমুসলমানদের। যাদের হাতে অনেক সময়ই নথি থাকে না। তথ্য প্রমাণ থাকে না। এক কাপড়ে ঘর ছাড়ার সময় কে আর সেসব আনে! তাদের অনেকেই ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। ভোট দেন। তবুও তাদের শুনতে হয় যে তারা উদ্বাস্তু। সেই বাড়তি অসম্মানের পরিচয়টাকে বিতাড়িত করবে সিএএ। সিএএ আর কাউকে বিতাড়িত করতে আসেনি।

প্রশ্ন উঠছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস গরমাগরম ভাষণ দিচ্ছে, সিএএ নাকি অসাংবিধানিক। সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সংবিধানের মূল সুর ছন্দের পরিপন্থী কোনো ভাবেই নয়। কারণ যারা বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে তাদের জানা উচিত সিএএ কোনো ভাবেই সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ অনুচ্ছেদকে বিরোধ বা উলঙ্ঘন করছে না। ইউপিএ আমলেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ নাগরিকত্ব আইনের ৭ (ক) ধারাটি সংশোধন করে বলেছিলেন Provided that no person who is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central Government may by notification in the official gazzette specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of India. সেই সংশোধনে 'গেল গেল' রব তোলেননি মমতা ব্যানার্জি। তবে আজ এই মানবদরদি আইনে এত আপত্তির কারণ কী? কেন বারবার বলছেন ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান হচ্ছে। যা সর্বৈব মিথ্যা। বরং ধর্মের ভিত্তিতেই নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে না, প্রতিবেশী ইসলামিক দেশের থেকে প্রাণ হাতে পালিয়ে সব অমুসলমানদেরই তাদের তাচ্ছিল্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে এই আইন। যেখানে কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ কিছুই বিচার করা হচ্ছে না। বিচার করা হচ্ছে তারা সবাই একই পরিস্থিতির শিকার কিনা।

২০০৩-এর ১৮ ডিসেম্বর, মনমোহন সিংহ বিরোধী দলনেতা হিসেবে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর কাছে আবেদন করেন দেশভাগের পর ইসলামিক দেশগুলোতে সংখ্যালঘুরা বড্ড অত্যাচারিত। তারা যদি ভারতে আশ্রয় নেন তবে দেশ হিসেবে ভারতের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আজ সেই নৈতিক দায়িত্ব পালনের সাংবিধানিক নাম সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস তবে এত সরব কেন? যেখানে ভারতের মুসলমানদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বিরোধীরা বিশেষ করে যারা সংখ্যালঘু তোষণ নির্ভর ভোটব্যাংক হুমড়ি খেয়ে ব্যালটে বাঁদরের পিঠে ভাগ করে তাদের বেজায় আপত্তি।

সিএএ একজনও ভারতবাসীর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত নয়। তবে এত রাজনৈতিক হল্লা যে বড়ো! প্রথমত বড়ো অংশের হিন্দুভোট তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা। মমতা ব্যানার্জি নিবিড় ভাবে আত্মস্থ করেছেন এই আইন। তাই আরও বেশি ভাবে রাজনৈতিক ভাষণে বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে। তিনি মিথ্যা ভীতি প্রদর্শন করছেন এই ভাবে— 'তোমাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে। যদি জমি বাড়ি সব কেড়ে নেয় সিএএ-এর অজুহাতে। যদি বলে দেয় তুমি অনুপ্রবেশকারী। তুমি অবৈধ। তবে কী করবে? তাই আমাকেই ভোট দাও।' সচেতন মানুষ জানেন, সর্বৈব মিথ্যা ভাষণ। তবুও বোধহয় কিছু মানুষের এক প্রকার বিভ্রান্তি, আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের এমন সব অবৈজ্ঞানিক দিশাহীন ভোটমুখী ভাষণে। ১৫-২০ বছর আগে এক হিন্দু পরিবার বাংলাদেশে টিকতে না পেরে এক রাতের অন্ধকারে কোনোমতে প্রাণ হাতে নিয়ে পরিবার শুদ্ধ হাজির হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তারপর তারা তৎকালীন রাজনৈতিক নেতার বা দলের কৃপায় ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। ভোট দিলেন। জীবন তার ছন্দ পেয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নথি তাদের নেই। পরিস্থিতির চক্রান্তে তারা প্রাণটুকুই আনতে পেরেছিল। তাদের মতো পরিবারগুলিকে বেশ বিভ্রান্ত করতে পারছে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক গরমাগরম শঙ্কিত করা ভাষণ। সেই সব পরিবারের মানুষগুলো ভাবছে যদি আইন আসে তবে যদি ধরা পড়ে যাই! আমাদের ভোটার তালিকায় নাম আসা এবং তৎকালীন নেতার

দাদাগিরিতে মিথ্যা শপথনামার ছবিতো ধরা পড়ে যাবে! আমিতো তবে ভোটার তালিকা থেকেও বাদ যাব আর আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। এই মিথ্যে ছবিটাই প্রজেক্ট করছেন মমতা ব্যানার্জি। তিনি জানেন এই আইনে এমন কোনো কথাই উল্লেখ করা হয়। বরং সিএএ-২ (১) (বি) উল্লেখ রয়েছে পাসপোর্ট আইন ও ফরেনার্স আইন ওই সকল অমুসলমানদের জন্য প্রয়োজ্যই হবে না। সিএএ-এর তাৎপর্য, উপকারিতা অনুভব করলে ওই যে ওদেশ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ হিন্দু তারা যে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রাণিত ভোটার নাও থাকতে পারে, সেই আশঙ্কায় এই রাজনৈতিক মিথ্যাচার। মমতা ব্যানার্জি পরোক্ষভাবে চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গাদেরও যেন একই ভাবে সমাদর করা হয়।

শেখ শাজাহানদের কৃপায় যত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এখানে থাকে, ঘাপটি মেরে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করে, যারা 'ক্যা ক্যা ছি ছি'-তে গলা মেলায় তাদের সবার জিনে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' সজীব। ২০০৫-এ সংসদে মমতাই বলেছিলেন The infiltration in Bengal has become a disaster now. এও বলছেন, ভোটার তালিকায় অনেক বাংলাদেশির নাম আছে। সেদিন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ইস্যু যে তিনি স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী, ডেপুটি স্পিকার চরঞ্জিত সিংহ অটওয়ালকে লক্ষ্য করে একগুচ্ছ কাগজ ছুঁড়ে দেন। আজ কি তবে সেই বাংলাদেশি (মুসলমান অর্থে) অনুপ্রবেশকারী ভুয়ো ভোটাররাও মমতার ভোটব্যাংকে প্রভাব ফেলে! তাই তিনি বলছেন কোনো বাছবিচার করা যাবে না— সবাইকেই নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে। তিনি এর মধ্যে দিয়ে অত্যাচারিত হিন্দুদের, যারা প্রকৃত শরণার্থী, তাদের সমস্যা, উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা, যুদ্ধ, সংঘর্ষকে তাচ্ছিল্য করছেন। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক অভিসন্ধি সমকক্ষে আনছে একজন শরণার্থী এবং একজন অনুপ্রবেশকারীকে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মূলত শরণার্থী হিন্দুদের রক্ষাকবচ, তাই মুসলমান ভোটার (যারা প্রকৃত ভোটার) মনস্তাত্ত্বিক তোষণে সদা উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল মমতা ব্যানার্জি।

বাকি রইল ভারতের বামপন্থীদের দ্বিচারিতা আর রাজনৈতিক ভণ্ডামি। ২০১০ সালে সিপিআইএম নেতা গৌতম দেব প্রকাশ্যে বলছেন শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক।

> **সেইসব মানুষকে তাদের হারানো ঠিকানা ফিরিয়ে দিতে না পারুক, কিন্তু নতুন ঠিকানায় হারানো সম্মান দু' হাত ভরে দেবে এই নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন - ২০১৯ (সিএএ)।**

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অনবরত অত্যাচার চলছেই। যখন ২০১২-র এপ্রিলে (৪-৯) কোঝিকোড়ে সিপিআইএমের পলিটব্যুরো বৈঠক হয় তখনও বলা হলো, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু'দের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হোক। সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া সংসদে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সবটাই ভাষণ আর রাজনৈতিক কচকচানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মরিচঝাঁপি গণহত্যার ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য বামপন্থীদের এমন সব প্রসঙ্গ বারবার কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সামনে পুতুলনাচের মতো এনেছে। আজ যেই না সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বলবৎ হচ্ছে তখনই স্বভাবসিদ্ধ তোষণ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাদের দাবি, শুধু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিলে হবে না, তিন ইসলামিক দেশ থেকে আসা মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব দিতে হবে। তখন তারা উত্থাপন করছে সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদের। সংবিধানের ১৪-তে বলা আছে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের কথা।

তারপর Citizenship সংক্রান্ত অংশে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে Foreigners do not have a fundamental right to obtain Indian Citizenship. তাই স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী ও বিরোধীদের অতি অবশ্যই শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য বুঝতে হবে। যদি ইসলামিক দেশের থেকে আসা একদল/গোষ্ঠী ইসলামপন্থী মানুষ অনুপ্রবেশকারী নাও হন সেক্ষেত্রেও তিনি নাগরিকত্ব পাবেন কিনা তা স্থির ও নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার রাখে সংসদ। ওই অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে concept of equality cannot be pressed to commit another wrong. সুতরাং যারা পরিস্থিতির শিকার (বাংলাদেশের থেকে আসা হিন্দুরা) এবং যারা ইচ্ছাক্রমে বা অভিসন্ধিতে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে (বাংলাদেশের মুসলমান) ভারতে এলেন তারা কখনওই Equality দাবি করতে পারে না। ইসলামিক দেশ থেকে একজন হিন্দুকে আকাশভেদী যন্ত্রণা নিয়ে এদেশে আসতে হয়। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে তো একজন মুসলমান বাংলাদেশ থেকে হঠাৎ করে এদেশে আসছে না। তাই Equality of the equals-টাও মনে করার দরকার।

যারা মঞ্চে উঠে বলছে— আমরা বৈষম্য মানি না। তাদের স্মরণ করাতে চাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনও কোনো বৈষম্য মানে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শরণার্থীদের নাগরিকত্বের সমানাধিকারের পুণ্যব্রতে হাজির। রাষ্ট্রনীতিতে উদীয়মান ভারত কোনো ভাবেই কাঠগড়ায় দাঁড়াবে না। হয়তো কিছু মানুষকে মমতা ব্যানার্জি এবং বাম-কংগ্রেস একযোগে বিভ্রান্ত করছে। তার ফলে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন তার গুরুত্ব ও মুশকিল আসান তেজ থেকে বিচ্যুত হবে না। হারানো ঠিকানা ফিরিয়ে দিতে না পারুক, নতুন ঠিকানায় হারানো সম্মান দু' হাত ভরে দেবে সিএএ। এতদিন বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল সবাই উদ্বাস্তুদের জন্য মায়াকান্না কেঁদেছে। মানুষ ধলেশ্বরীর তীর থেকে এসেছে, শিয়ালদহ স্টেশনে চলে গেছে, আগরতলায় চলে গেছে, আন্দামানে চলে গেছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সেই সব মানুষদের নতুন ভাগ্যপট তৈরি করবে, সেদিনের রাশি রাশি উন্মুখ জীবন এবার পশ্চিমবঙ্গের এবং যে যেখানে রয়েছে সেখানের ভূমিপুত্র। □

বাঘের গল্প

বাঘ যে কেমন ভয়ংকর জন্তু সে কথা আর আমাদের বলে বোঝাতে হয় না। এই ভয়ংকর জন্তু যে মাঝে মাঝে হাসিরও কাজ করে, সে কথাই আজ বলতে এসেছি। দুঃখের বিষয়, গল্পগুলো সবকটিই সত্যি কিনা, একথা ঠিক করে বলবার উপায় নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যারা প্রথমে গল্পগুলো বলেছিল, তারা খুব গম্ভীরভাবেই বলেছিল।

বাঘের যদি কোনোরকম খাবার না জোটে তবে দু'একটা মাছ ধরে খেতে তার আপত্তি নেই। এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে, একবার তাঁকে নৌকায় চড়ে কয়েক মাস সুন্দরবনে থাকতে হয়। সে সময় তিনি রোজ ভোরবেলায় একটা বাঘকে দেখতে পেতেন, জলের ধারে ধারে চলে যায় আর মাঝে মাঝে খপ্ করে যেন একটা কিছু ধরে সেটাকে কাদায় গুঁজে রাখে। খানিক বাদে আবার সে ফিরে আসে, আর সেই জিনিসগুলো তুলে খায়। ভদ্রলোক ভাবলেন, বিষয়টা কী, না দেখলে তো নয়। তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন, শিকার করা ছিল তাঁর কাজ। তাই পরদিন ভোরবেলায় বাঘ আসামাত্রই তিনি বন্দুক হাতে তৈরি হয়ে থাকলেন। বাঘ শিকার ধরে কাদায় গুঁজতে গুঁজতে যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তখন তিনিও নৌকা থেকে নেমে সে পথে চললেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, বাঘ যে শিকার ধরেছে, সেগুলো ছোটো ছোটো মাছ। বাঘের মেজাজটা বোধ হয় একটু শৌখিন ধরনের ছিল, খেতে খেতে শিকার ধরাটা যে পছন্দ করত না। তাই সে আগে অনেকগুলো মাছ ধরে নিয়ে, তারপর মনের সুখে সেগুলো খেত। যা হোক, সেদিন অন্তত তার মাছ ধরাই সার হয়েছিল, খাবার সুবিধে আর হয়নি।

আর-এক বাঘ এক বিলের ধারে গিয়েছিলেন, মাছ ধরে খেতে গিয়েই তিনি দেখলেন, জলের উপরে একটা মাছ ছটফট করছে। বাঘ মশাই তো তখনই তাকে কপ্ করে গিলে বসেছেন। সেটা যে একটা প্রকাণ্ড বঁড়শিতে গাঁথা ছিল, সেদিকে খেয়াল করেননি। বঁড়শি তো মাছের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তার পেটে গিয়ে বিঁধে বসেছে; তারপর বাঘমশাই যখন চলে যাচ্ছেন, তখন সে বলে 'কোথায় যাও?' সে রাত্রে বাঘের চিৎকারে আর আশেপাশের গাঁয়ের লোকের ঘুম হয়নি। তার পরদিন সকালবেলায় তারা এসে দেখে, বাঘ বঁড়শি গিলে হাঁ করে মরে রয়েছে।

আর-এক বাঘ গিয়েছিল কুয়োর ধারে, বাছুর খেতে। বেটা এমন আনাড়ি ছিল যে, লাফিয়ে কোথায় বাছুরের ঘাড়ে পড়বে, না সে কুয়োর ভেতরে। তখন যে চিৎকার! কিন্তু চ্যাঁচালে কী হবে? তাতে তো কুয়ো থেকে উঠে আসা যাবে না, লাভের মধ্যে বাঁশ নিয়ে গাঁয়ের লোক এসে হাজির হলো। তারপর যা হলো বুঝতেই পার।

আর-এক বাঘ গাছে উঠে বসেছিল। মতলবটা এই ছিল যে, সেই পথে গোরু বাছুর এলে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। গোরু যখন এল, তখন সে লাফ দিল বটে, কিন্তু গোরুর ঘাড়ে পড়বার আগেই পেটে বিষম বাঁশের খোঁচা লেগে তার প্রাণ বের হয়ে গেল। একটা বাঁশ কেউ তেরচা করে কেটে নিয়েছিল, তার গোড়ার দিকটা ছুরির মতন ধারালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঘ তা দেখতে পায়নি।

সান দেশে ভয়ানক বন, আর তাতে বাঘও তেমনি। সেই দেশে আমাদের একজন জরিপ করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে লোকজন অনেক ছিল, আর ছিল তার চাকর শশী। সকালে উঠেই চারটি খেয়ে জরিপে বের হতে হয়, তার আগে রান্না শেষ হওয়া চাই। তাই রাত চারটায় ওঠবার জন্য ঘড়িতে 'অ্যালার্ম' চড়িয়ে রাখে। থাকতে হয় তাঁবুতে। শশীর এক তাঁবু, তার মনিবের এক তাঁবু, আর সকলের আলাদা আলাদা তাঁবু। রাতে বাঘ এসে শশীর তাঁবুতে মাথা ঢুকিয়েছে। একেবারে ভেতরে আসতে পারেনি, তাঁবুর বেড়ার তলা অব্দি ঢুকিয়ে ঠেলাঠেলি করছে, আর চারদিক হাতড়াচ্ছে, আর আধহাত এলেই শশীর মাথা পাবে। এমন সময় 'ক্ক-ড়্-ড়্-র্-র্—' শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল। বাঘ ভাবল 'সর্বনাশ! বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ল।' সে বেজায় চমকে গিয়ে এমন এক লাফ দিল যে, তাতে তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে, খোঁটা উপড়ে একেবোরে তাঁবুসুদ্ধ ওলটপালট! গোলমাল শুনে সকলে ছুটে এসে দেখল, কী ভয়ানক ব্যাপার! তাঁবুর ভেতরে বাঘের বুকের দাগ আর নখের আঁচড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভগবানের দয়ায় ঠিক সময়টাতে অ্যালার্ম না পড়লে আর উপায়ই ছিল না।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নদ-নদী পরিচয়

আত্রেয়ী নদী

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী। শিলিগুড়ির ১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে হিমালয় পর্বতমালায় উৎপত্তি। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট ব্লকের ওপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এককালে এই নদী উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী ছিল। মহাভারতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগেও এই নদীর নাম উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে নদীটি শীর্ণকায়। উৎপত্তিস্থলের একটু দূরেই বাংলাদেশে এই নদীতে কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে

জলধারা আটকে দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট শহরের একাধিক সংগঠন আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ১৬

অন্যত্র (অন্য কোথাও)

প্রধানমন্ত্রী অন্যত্র অস্তি।
প্রধানমন্ত্রী অন্য কোথাও আছেন।
প্রধানমন্ত্রী কুত্র অস্তি?
প্রধানমন্ত্রী কোথায় আছেন?

অভ্যাস করি–

সুদীপ্তা মহোদয়া কুত্র অস্তি?
সুদীপ্তা মহোদয়া অন্যত্র অস্তি।
পিন্টু: মহোদয়: কুত্র অস্তি?
পিন্টু: মহোদয়: অন্যত্র অস্তি।
স্যূত: (ব্যাগ) অন্যত্র অস্তি।
ফেনকম্ (সাবান)অন্যত্র অস্তি।

প্রয়োগ করি –

অন্যত্র দ্বারা দ্বিত্রাণি বাক্যানি বদতু –
সোপানম, মার্গ: , বৃষ্টি:, যানম, আন্ধ্রপ্রদেশ:, নদী, প্রশিক্ষক:, পরীক্ষাকেন্দ্রম।

ভালো কথা

আমার রামলালা দর্শন

জানুয়ারি মাসে পনেরো দিন ধরে আমরা বাড়ি বাড়ি শ্রীরামমন্দিরের নিমন্ত্রণ করছিলাম। ২২ তারিখে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর আমাদের নগর কার্যবাহ অমিতদা রামলালা দর্শন করে অযোধ্যা থেকে ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে প্রসাদ দিতে এসেছিলেন। তখনই আমার দাদাজী আর দাদিমা অযোধ্যায় যাবেন বলে মনস্থ করলেন। মার্চ মাসের ৬ তারিখে সেই সুযোগ এসে গেল। আমিও তাদের সঙ্গে রওনা হলাম। সঙ্গে দেবুদা, কৃষাণুদা, সুদেবদা ছিলেন। আস্থা স্পেশাল ট্রেনে আমরা পরদিন সন্ধ্যায় অযোধ্যা পৌঁছালাম। প্রথনেই হনুমানগড়ি ও আরও কয়েকটা মন্দির দেখলাম। পরদিন খুব সকালে রামলালা দর্শন করে সারাদিন অযোধ্যার বিভিন্ন মন্দির দেখলাম। সন্ধ্যায় ফেরার জন্য ট্রেনে উঠলাম। অযোধ্যা দর্শন আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার দাদাজী ও দাদিমাও খুব আনন্দ পেয়েছেন।

বিবেক রজক, সপ্তমশ্রেণী, ১৩ আর এন সেন লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বৃষ্টি ও ভাই

পৃথা সেন, ষষ্ঠ শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

ভাইকে বলি চুপ চুপ
বৃষ্টি পড়ে টুপ টুপ,
এই বৃষ্টিতে ভিজলে পরে
ভুগতে হবে ভীষণ জ্বরে।
রবিবার দুপুরবেলা
সবাই যখন ঘুমিয়ে,
ভাইটি আমার চুপি চুপি
ভিজতে থাকে বৃষ্টিতে।

দুপুরবেলা ঠাকুমা শুধু
একলা জেগে থাকে
গুনগুনিয়ে পাঁচালি সব
পড়ে মনের সুখে।
হঠাৎ দেখে ভাইটি তখন
বৃষ্টিতে খুব ভিজছে,
ঠাকুমা তখন ছুটে এসে
কোলে তুলে নিচ্ছে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

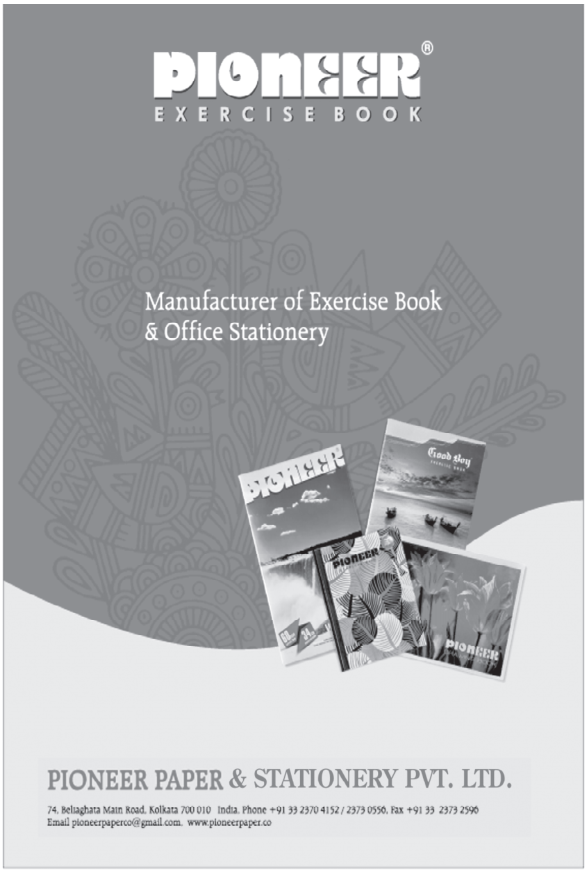

With Best Compliments from -

A
Well wisher

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্র পরিচিতি

১. কোচবিহার : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৮,১৪,২০০

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসি'র প্রাপ্ত ভোট : ৫,২৬,৪৯৯

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট : ২,১৭,৬৫৩

২০১৬ লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৯৪,৩৭৫

২০১৬ লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৮১,১৩৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৩১,৫৯৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৭,৩৬৩

২. আলিপুরদুয়ার : আসনটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— তুফানগঞ্জ, কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট, নাগরাকাটা।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৭০,৯১১

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৬২,৪৫৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৩৫,৮৫৭

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৫০,৮০৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০৬,৮১৫

৩. জলপাইগুড়ি : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— মেখলিগঞ্জ, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৩,৫১,৪৬৯

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৯৪,৭৭৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,২১,৫৯৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৬০,১৪৫

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৬,১৪১

৪. দার্জিলিং : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, চোপড়া।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৩৭,১২৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৮৮,২৫৭

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ২,৯১,০১৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৫০,০৬৭

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৩৬,৬২৪

৫. রায়গঞ্জ : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৩,৮৭,৫২৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৩,১৭,৫১৫

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,০৩,১৩১

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,১১,৬৫২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫১,০৭৮

৬. বালুরঘাট : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো---ইটাহার, কুশমণ্ডী, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১২,৫৪,৪৯৭
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,০৯, ৬৪১
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,২৩,০১৪
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৩৯, ৩১৭
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০৬,০২৪

৭. মালদহ উত্তর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর, রতুয়া, মালদহ।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,২৫,৪২৮
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৩,৮৮, ৬০৯
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৭৯,০০০
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০৯, ৫২৪
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,২৫,২৩৬

৮. মালদহ দক্ষিণ : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- মানিকচক, ইংলিশবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৩,৪৭,১৪৩
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৩,৮০, ২৯১
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,১৬,১৮১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৪,৪৪, ২৭০
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৩৬,০৪৮

৯. জঙ্গিপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— সূতী, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম, খড়গ্রাম।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৩,৯১,৬৫৬
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৩,৭৮, ২০১
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৭৫১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৬২, ৮৩৮
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,১৭,০৫৬

১০. বহরমপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— বড়ঞাঁ, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, নওদা।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৫৩,৭৮৩
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৫,৮৩, ৫৪৯
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৬৫৬
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯১, ১৪৭
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৩,০৩৮

১১. মুর্শিদাবাদ : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গী, করিমপুর।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,১২,০৯৮
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৪,২৬, ৯৪৭
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,০৬৯
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,০৪, ৩৪৬
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৪৭,৮০৯

১২. কৃষ্ণনগর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- তেহট্ট, পলাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৭৬,৭৮৩
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৩৮, ৭৮৯
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,২৯,৮৭৩
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,১৪, ৮৭২
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৫১,৬৫৪

১৩. রাণাঘাট : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট উত্তর-পশ্চিম, রাণাঘাট উত্তর-পূর্ব, কৃষ্ণগঞ্জ, রাণাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৭,৫৬,৪৪৫
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯০, ৪৫১
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৩৩,৬৭০
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৮৩, ২৫৪
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৪৯,৮২৫

১৪. বনগাঁ : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদহ, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা,

স্বরূপনগর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,৪০,৭১৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৫১,২১৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৪৪,৭৮৩

২০১৫ লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৩৯,৯৯৯

২০১৫ লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,১৪,২১৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮৭,৬২২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৬,০২৮

১৫. ব্যারাকপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৩৩,২৭৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭৯,২০৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৩০,৪০১

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭২,৯৯৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৮,১৩৭

১৬. দমদম : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— খড়দহ, উত্তর দমদম, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম, রাজারহাট-গোপালপুর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,০৫,৯৮১

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৮৩,২৪৪

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৫৪,৮১৯

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,১২,০৬২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৯,০৬৩

১৭. বারাসত : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- হাবড়া, অশোকনগর, রাজারহাট-নিউটাউন, বিধাননগর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দেগঙ্গা।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,১২,৭৯২

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২৫,৩৮৭

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৯৬,৬০৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৪৮,৪৪৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৩৮,২৭৫

১৮. বসিরহাট : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট উত্তর, বসিরহাট দক্ষিণ, হিঙ্গলগঞ্জ।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৯০,৫৯৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৯২,৩২৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৩৩,৮৮৭

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৮২,০৭৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৩১,৭০৯

১৯. জয়নগর : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,৪৫,২০৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৯৪,৭৪৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,২০৬

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৬১,২০৬

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৪৪,৪২৭

২০. মথুরাপুর : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, মগরাহাট পশ্চিম।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,৪৯,৯৫৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,২৭,৭৬১

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬৬,৫৩৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,২৬,৮২৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২২,৮৫৪

২১. ডায়মন্ড হারবার : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৭,১২,৬১২

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০৮,৪৮১

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,০০,৮৫৮
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৯১,১২৭
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭০,৫৩৩

২২. যাদবপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর উত্তর, সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, যাদবপুর, টালিগঞ্জ।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৮,০২,২৩৪
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৮৪,২৪৪
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৫৫,৫১১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮৮,৪৭২
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৯৩,২৩৩

২৩. কলকাতা দক্ষিণ : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— কসবা, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৭,১৯,৮২১
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৩১,৭১৫
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৯৫,৩৭৬
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৩,১১৯
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,১৭,৯২৭

২৪. কলকাতা উত্তর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৩৭,৯১২
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৪৩,৬৮৭
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৪৭,৪৬১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭৪,৮৯১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৪৭,৭৯৬

২৫. হাওড়া : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, হাওড়া দক্ষিণ, শিবপুর, সাঁকরাইল, পাঁচলা।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,০৫,০৯৯
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৮৮,৪৬১
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৪৮,১২০
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৬,৭১১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭৩,০১৬

২৬. উলুবেড়িয়া : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,৭৮,০৩২
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭০,৭৮৫
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৭,১৩৭
২০১৮ লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৬৭,৫৫৬
২০১৮ লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৯৩,০৪৬
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৯৪,৯৪৫
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭৯,৫৮৬

২৭. শ্রীরামপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,২৪,০৩৮
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,১৪,৯৩৩
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৮৭,৭১২
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৩৭,৭০৭
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৩৯,১৭১

২৮. হুগলি : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, ধনেখালি।
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,৩০,০৪২
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,১৪,৩১২
২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,২১,২৭১
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭১,৪৪৮
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯৮,০৮৬

২৯. আরামবাগ : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো—

হরিপাল, তারকেশ্বর, পুড়শুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, চন্দ্রকোণা।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,০০,২৯৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৪৮,৭৬৪

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৫৮,৪৮০

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৪৯,৯২৯

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৪৮,৭৮৭

৩০. তমলুক : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,২৭,২৭৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১৬,৯২৮

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,২৬৫

২০১৬ লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৭৯,৫৯৪

২০১৬ লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৯৬,৪৫০

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,২৪,৪৩৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৩৪,২৬৮

৩১. কাঁথি : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, কাঁথি দক্ষিণ, ভগবানপুর, খেজুরি, রামনগর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৯০,৪০৯

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৬,৭৪৯

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,০৮২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১১,৮৭২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,০০,২০৪

৩২. ঘাটাল : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— পাঁশকুড়া পশ্চিম, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, কেশপুর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,১০,৪৮৯

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮৫,৬৯৬

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৮৪২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১৭,৯৫৯

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,০৯,৯৮৬

৩৩. ঝাড়গ্রাম : আসনটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, শালবনী, বিনপুর, বান্দোয়ান।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৭৫,১১২

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৪,৫০৪

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,২২,৪৫৯

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,২৬,৫৮৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,১৪,৮১৬

৩৪. মেদিনীপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— এগরা, দাঁতন, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর সদর, নারায়ণগড়, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৯৯,৬৭৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৮১,৮৬০

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৮০,০৭১

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮৫,৪৩৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯৬,৪৮১

৩৫. পুরুলিয়া : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো--- বাঘমুণ্ডি, মানবাজার, বলরামপুর, কাশীপুর, পারা, জয়পুর, পুরুলিয়া।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৭১,৯৩৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৮৮,২৭৭

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,২৩৬

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৬৮,১০৭

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৬৩,৩৭৫

৩৬. বাঁকুড়া : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা, বাঁকুড়া।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,০৩,৮১২

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৮৩,৪৫৫

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৫১,১৮৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৫,৩১৯

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০০,৯৮৬

৩৭. বিষ্ণুপুর : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী, খণ্ডঘোষ।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৬৬,৯২১

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৮,৮৭০

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৭৯,৫৩০

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৫৭,০১৯

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৮,৯৭২

৩৮. বর্ধমান পূর্ব : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— রায়না, জামালপুর, কালনা, মেমারি, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, কাটোয়া।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,৩২,২৪৪

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৪,৬৬০

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৭০,৮২৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৪০,৮৩৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৫১,৫২৩

৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, মন্তেশ্বর, ভাতার, গলসি, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,৮৩,৪৯৮

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৫৪,৫২১

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৩৭,২০৫

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯৮,৩৭৬

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯৫,৯৩৭

৪০. আসানসোল : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসালসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি, বারাবনী।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৬,১৫,৮৬৫

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,১৯,৯৮৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৪৯,৫০৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৩৩,৩৭৮

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৩৫,৭৪১

২০২২ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৫৬,৩৫৮

২০২২ লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৫৩,১৪৯

৪১. বোলপুর : আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, ময়ূরেশ্বর।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৫,৩৮,৪২৯

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৩০,৬৯৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ১,৯৭,৪৭৪

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৯৯,১৭২

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯২,৭৬৯

৪২. বীরভূম : আসনটি অসংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র হলো— দুবরাজপুর, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি, মুরারই।

বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ১৪,৯৫,১০৮

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৬০,৫৬৮

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৩৫,৭৫৩

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৫৪,০৭০

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৬৫,১৫৩

With Best Compliments from -

A Well wisher

কান্তজিউ মন্দিরের জমি দখল করে মসজিদ-মাদ্রাসা

কিশোর চন্দ্র দাস॥ বাংলাদেশের দিনাজপুর-কাহারোল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কান্তজিউ মন্দিরের জমি দখল করে চলছে মসজিদ নির্মাণ। গত ১ মার্চ দিনাজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য জাকারিয়া জাকা মসজিদ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। কান্তজিউ মন্দিরটি 'কান্তজীর মন্দির' বা 'কান্তনগর মন্দির' নামেও পরিচিত। মন্দিরটি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার অন্তর্গত সুন্দরপুর ইউনিয়নের কান্তনগর গ্রামে অবস্থিত। কান্তজিউ মন্দিরটি ৩০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন হিন্দু মন্দির। মহারাজ প্রাণনাথ রায় মন্দিরটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রী রুক্মিণীকে উৎসর্গ করে নির্মাণকাজ শুরু করেন। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ শুরু হয়, একটানা প্রায় ৪৮ বছর মন্দিরের নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকে এবং ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রামনাথ রায়ের রাজত্বকালে শেষ হয়। পৌরাণিক কাহিনিসমূহ পোড়ামাটির অলংকরণে মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটিতে বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। প্রতি বছর শীতের শুরুতে মন্দির প্রাঙ্গণে এক মাস ব্যাপী রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা চলাকালীন ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু তীর্থযাত্রী মন্দিরে আসেন। ২০১৭ সালের কলকাতা বইমেলায় বাঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নটি কান্তজিউ মন্দিরের আদলে গড়া হয়। কান্তজিউ মন্দির নির্মাণের সময় মহারাজ প্রাণনাথ পারস্য থেকে কিছু স্থপতি ও নির্মাণশিল্পী নিয়ে এসেছিলেন। এই নির্মাণশিল্পী ও শ্রমিকরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তারা মহারাজের কাছে নামাজ পড়ার অনুমতি নিয়ে কান্তজীর মন্দিরের ১ কিলোমিটার দূরে নয়াবাদে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যা নয়াবাদ মসজিদ নামে পরিচিত।

কান্তজিউ মন্দির

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে কান্তজিউ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তিতে হঠাৎ করে দেখা যায় দুটি টিন-চাটাইয়ের ঘর ওঠে। তার সামনে বাঁশের খুঁটিতে একটি সাইনবোর্ড বসে। তাতে লেখা--- শান্তিবাগ আল হেরা নূরানী তা'আলীমুল কুরআনা মাদ্রাসা। সেই সময় দিনাজপুর রাজ দেবোত্তর এস্টেটের এজেন্ট অমলেন্দু ভৌমিক জানান, বীরগঞ্জের মাকড়াই মৌজায় কান্তজিউ ঠাকুরের নামে মোট ১৬ দশমিক ৫৩ একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে ৩৩ শতক জমিতে ওই মাদ্রাসার ঘর তোলা হয়েছে। লক্ষণ বুঝে ওই সময় বীরগঞ্জ কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান উন্নয়ন কমিটির উপদেষ্টা মতিলাল দাস ২০০৯ সালের জানুয়ারি স্থানীয় থানায় জিডি করেন। তারপরও ঘর ওঠে, পুলিশও বাধা দেয়নি। ২০১৫ সালের ৫ ডিসেম্বর গভীর রাতে ৩০০ বছর ধরে চলা রাসমেলায় তিনটি ককটেল বোমা ছোঁড়া হয়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন। তিনজনের অবস্থা ছিল গুরুতর। এই জেহাদি হামলার আগে মন্দিরের পুরোহিতকে কোনো ধর্মীয় সমাবেশ না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়। মার্কিন কংগ্রেস সদস্য তুলসী গ্যাবার্ড এই ঘটনার নিন্দা করেন। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাটকে মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের অবস্থা দেখতে অনুরোধ করেন। এই হামলার সঙ্গে জড়িত দুই জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলাদেশের পাসপোর্ট বইয়ের ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল জলছাপে কান্তজিউ মন্দিরের ছবিটি ছিল। ২০২২ সালে দেখা যায় পাসপোর্ট বইয়ের ওই দুটি পৃষ্ঠা থেকে কান্তজিউ মন্দিরের ছবিটি মুছে ফেলা হয়েছে। গত ১ মার্চ, ২০২৪-এ দিনাজপুর-কাহারোল উপজেলার কান্তনগর গ্রামের কান্তজিউ মন্দিরের রাজ দেবোত্তর এস্টেটের জমিতে মসজিদ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করে আওয়ামি লিগ নেতা দিনাজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. জাকারিয়া জাকা। গত ১৩ মার্চ এই অবৈধ নির্মাণকাজ বন্ধের দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসক সমীপে লিখিত অভিযোগ করেন বর্তমান দিনাজপুর রাজ দেবোত্তর এস্টেটের এজেন্ট রণজিৎ কুমার সিংহ। তাঁর লিখিত অভিযোগে তিনি বলেছেন, 'কাহারোল উপজেলার কান্তনগর মৌজায় সিএস ২ নম্বর

খতিয়ানটি শ্রীশ্রী কান্তজিউ বিগ্রহ পক্ষে সেবাইত মাননীয় মহারাজা জগদীশ নাথ রায় নামে নথিভুক্ত। ওই খতিয়ানে কান্তজিউ বিগ্রহের নামে ৯৪ দশমিক ০৭ একর জমি রয়েছে। এসএ ০৫ নম্বর খতিয়ানে দিনাজপুর রাজ দেবোত্তর এস্টেটের পক্ষে ১৯টি দাগে ৬২ দশমিক ৪৬ একর জমি রয়েছে যার জিম্মাদার জেলা প্রশাসক। বাংলা ১৪৩০ সন পর্যন্ত জমির খাজনা হালনাগাদ রয়েছে। গত ১০ মার্চ জানা যায় যে, কান্তনগর মৌজার ১৬ নম্বর দাগে রাজ দেবোত্তর এস্টেটের সম্পত্তির ওপর একটি পাকা মসজিদ তৈরি হচ্ছে। প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানান, মসজিদটি রাজ দেবোত্তর এস্টেটের কান্তনগর মৌজার এসএ ৫ নম্বর খতিয়ানের ১৬ নম্বর দাগের ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মোজাম্মেল হকের কাছে কীভাবে রাজ দেবোত্তর এস্টেটের জায়গায় তারা মসজিদ নির্মাণ করছে জানতে চাইলে সে জানায়, ১৯৭৬ সালে ডিসি দিনাজপুর (জেলা কালেক্টর) ওই জমি তাদের দিয়েছেন। তার কাছে দলিল দেখতে চাইলে তিনি একটি হাতে লেখা তিন পৃষ্ঠার আপোশনামার ফোটোকপি দেখান। সেই তথাকথিত আপোশনামাটি যাচাই করে দেখা যায়, সেটি কোনো বরাদ্দ নয়। কোনো রেজিস্ট্রিকৃত জমির দলিল নয়। ওই কাগজে মালিকানা হস্তান্তরের কোনো উল্লেখ নেই। আপোশনামাটি দেখে ভুয়ো বলেই মনে হয়। তা ছাড়া, ১৯৯৯ সালের ৫১ ডিএলআর অনুযায়ী, দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়, তা সব সময়ের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি।'

পূর্বতন সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল বলেন, 'বর্তমান সংসদ সদস্য গত ১ মার্চ সব জেনে শুনেই মসজিদের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। সেই মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করছে। মসজিদের নির্মাণকাজ বন্ধে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। নির্মাণকাজ চলছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টির সমাধানে বসার কথা বলে কালক্ষেপ করা হচ্ছে। এদিকে মসজিদ নির্মাণকাজ এগিয়ে চলেছে। নির্মাণ হয়ে গেলে সেই কাঠামো তো আর ভাঙা যাবে না। তাই যা কিছু করতে হয় অবিলম্বে করা উচিত।'

গত ২৯ মার্চ হতে প্রতি শুক্রবার কান্তজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে বিশ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ করার কথা থাকলেও রমজান মাসের কারণে জেহাদিদের চাপে সেই তারিখ পরিবর্তন করে আগামী ২০ এপ্রিল হতে প্রতি শনিবার করতে বাধ্য হয় বিশ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজক কমিটি। দেখা যাচ্ছে কান্তজিউ মন্দিরটি যেভাবে জেহাদিদের দ্বারা একটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে এই ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব রক্ষা করা বাংলাদেশের হিন্দুদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশে শ্রীরামমন্দিরের ভূমিপূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

দীপঙ্কর রায়॥ বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায়, ইতিহাসে এই প্রথম নান্দনিক ডিজাইনে প্রায় ৪৮ ফুট উচ্চতার শ্রীরামমন্দিরের ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গত ২০ মার্চ বেলা ২টায় লালমনিরহাট জেলার ঐতিহাসিক সিন্দুরমতি তীর্থধাম পুকুরপাড়ে শ্রীরামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, লালমনিরহাট জেলা শাখার সভাপতি হীরালাল রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ কুমার রায় এবং সিন্দুরমতি তীর্থধামের সভাপতি অতুল কৃষ্ণ রায়। অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সনাতনী উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুকুমার রায়। সারাদিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে, সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্বপ্নের ও সাধনার রামমন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ভগবাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তবৃন্দ। রামমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সনাতনী উন্নয়ন পরিষদের সম্মানীয় সহ-সভাপতি অভিজিৎ রায় বলেন, 'ঐতিহ্যবাহী সিন্দুরমতি পুকুরপাড়ে একটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই তীর্থধামে রামমন্দিরের ভূমিপূজন ও ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে আনন্দের জোয়ার ভেসে উঠেছে।' প্রায় ৪৮ ফুট উচ্চতার এই কাঠামোর মন্দিরের ডিজাইন বা নকশা তৈরি করেছেন শুভ্রকান্তি রায়। রামমন্দিরের সাধারণ সম্পাদক মৃণালকান্তি রায় জানান, 'ঐতিহ্যবাহী সিন্দুরমতি তীর্থধামে রামমন্দিরটি তৈরি হলে সকল ভক্ত শ্রীরামের এই মন্দির দর্শন করতে পারবেন। প্রতি বছর রামনবমী তিথিতে ঐতিহ্যবাহী সিন্দুরমতি তীর্থধামে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পুণ্য লাভের আশায় এই মেলায় সমবেত হন।'

মন্দিরের মডেল

এ বিষয়ে সনাতনী উন্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় জানান, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম নান্দনিক ডিজাইনে প্রভু শ্রীরামের মন্দিরটি স্থাপিত হচ্ছে। সকলের অনুদানের ভিত্তিতে আমরা সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে এসে মন্দিরটির নির্মাণে প্রথম ধাপে কিছু সিমেন্ট সরবরাহ করেছি। মন্দিরটি নির্মাণকল্পে আমাদের সহায়তা অব্যাহত থাকবে। আশা করি মন্দিরটি নির্মাণে সকলেই সহায়তা করবেন।'